আরেক রকম

অষ্টম বর্ষ প্রথম সংখ্যা
১-১৫ জানুয়ারি ২০২০   ১৬-৩০ পৌষ ১৪২৬

মূল্য : ৩০ টাকা

আরেক রকম

পাক্ষিক পত্রিকা, মাসের ১লা ও ১৬ই প্রকাশিত

স্বত্বাধিকারী : সমাজ চর্চা ট্রাস্ট

সম্পাদক

শুভনীল চৌধুরী

subhanilc@gmail.com

সম্পদকীয় দপ্তর

আরেক রকম

৩৯এ/১এ বোসপুকুর রোড, কলকাতা - ৭০০ ০৪২

প্রতি সংখ্যা ৩০ টাকা

বার্ষিক সডাক ৭০০ টাকা

এককালীন ৫০০০.০০ টাকা দিয়ে 'সমাজ চর্চা ট্রাস্ট'-এর সদস্য হলে তাঁকে *আরেক রকম*-এর স্থায়ী গ্রাহক করে নেওয়া হবে।

arekrakam@gmail.com
samajcharcha@gmail.com

স্বত্বাধিকারী

সমাজ চর্চা ট্রাস্ট

কমার্শিয়াল কমপ্লেকস (চতুর্থ তল)

৮১/২/৭ ফিয়ার্স লেন

কলকাতা ৭০০ ০১২

গ্রাহক পরিষেবা

রবিন মজুমদার

৯৪৩২২১৯৪৪৬

আরেক রকম

অষ্টম বর্ষ প্রথম সংখ্যা ১-১৫ জানুয়ারি ২০২০,
১৬-৩০ পৌষ ১৪২৬

Vol. 8, Issue 1st, Arek Rakam RNI No. WBBEN/2013/49896

সূ ◆ চি ◆ প ◆ ত্র

সম্পাদকীয়

ক্রুদ্ধ হন, জাজমেন্টাল নয় ৫

মূল্যবৃদ্ধি এবং মন্দা ৮

সমসাময়িক

তরুণ ভারত ১০

এনপিআর নিয়ে অবস্থান স্পষ্ট করুন মুখ্যমন্ত্রী ১৩

বরিসের ব্রিটেন বিজয় ১৫

এক মেষ-নাগরিকের আত্মবীক্ষা

অনুরাধা রায় ১৮

রাজভবন বনাম নবান্ন: ডুবছে উচ্চশিক্ষা

পার্থপ্রতিম বিশ্বাস ২১

ভারতের তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পের পঞ্চাশ বছর

দীপাঞ্জন গুহ ২৩

বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে

অম্বিকেশ মহাপাত্র ৩৭

অভিযুক্ত বিদ্যাসাগর: প্রসঙ্গ বিবেকানন্দ

শ্যামাপ্রসাদ বসু ৩৯

আজকের প্রাসঙ্গিকতায় বাংলার নবজাগরণ

প্রদীপকুমার ভাদুড়ি ৪৪

অঋণা কচুরিপানা

গৌতমকুমার দাস ৪৯

চিঠির বাক্সো ৫২

পুনঃপাঠ

কলকাতাতে কবিসঙ্গ

সুরজিৎ দাশগুপ্ত ৫৩

জীবনানন্দ ও সত্যজিৎ

সুরজিৎ দাশগুপ্ত ৫৭

প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক: অশোক মিত্র

উপদেষ্টা: অমিয়কুমার বাগচী

সম্পাদক
শুভনীল চৌধুরী

সম্পাদকমণ্ডলী
গৌরী চট্টোপাধ্যায়
কালীকৃষ্ণ গুহ
প্রণব বিশ্বাস
ইমানুল হক
শাক্যজিৎ ভট্টাচার্য
অমিতাভ রায়

প্রচ্ছদ
নামলিপি: হিরণ মিত্র
প্রচ্ছদ: মনোজ দত্ত

পরিবেশক
বিশাল বুক সেন্টার
৪ টৌটি লেন, কলকাতা-৭০০ ০১৬
ফোন: ০৩৩-৪০৬৪-৪০৯৭, ৪১০৩, ৬৩৫৩

বাংলাদেশ পরিবেশক
পাঠক সমাবেশ
শাহবাগ, ঢাকা ১০০০

আরেক রকম পত্রিকার জন্য যোগাযোগ স্থল
শিলিগুড়ি: নন্দদুলাল দেবনাথ, ৯৪৭৪৩৮৩৪৪২
বোলপুর: সোমনাথ সমাদ্দার, ৯৪৭৫৩৬৩৩৫২

ওয়েব সাইট: www.arekrakam.com

প্রতি সংখ্যা ত্রিশ টাকা

বার্ষিক সডাক সাতশো টাকা

এককালীন ৫০০০.০০ টাকা দিয়ে ‘সমাজ চর্চা ট্রাস্ট’-এর সদস্য হলে *আরেক রকম* আজীবন বিনামূল্যে পাওয়া যাবে।

সমাজ চর্চা ট্রাস্ট-এর পক্ষে তৃষিতানন্দ রায় কর্তৃক ৩৯এ/১এ, বোসপুকুর রোড, কলকাতা-৭০০ ০৪২ থেকে প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক এস. পি. কমিউনিকেশনস্ প্রা. লি., ৩১বি রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০০৯ থেকে মুদ্রিত।

বিজ্ঞপ্তি

১৯৫৬ সালের সংবাদপত্র রেজিস্ট্রেশন (কেন্দ্রীয়) আইনের ৮নং ধারা অনুযায়ী (৪নং ফর্ম) 'আরেক রকম' পাক্ষিক পত্রিকার স্বত্বাধিকার ও অন্যান্য বিষয়ে জ্ঞাতব্য।

১. প্রকাশের কাল	:	পাক্ষিক
২. প্রকাশকের নাম	:	তৃষিতানন্দ রায়
জাতি	:	ভারতীয়
ঠিকানা	:	এ. জে. ২৩৪, সেক্টর ২, সল্টলেক কলকাতা ৭০০ ০৯১
৩. মুদ্রকের নাম	:	তৃষিতানন্দ রায়
জাতি	:	ভারতীয়
ঠিকানা	:	এ. জে. ২৩৪, সেক্টর ২, সল্টলেক কলকাতা ৭০০ ০৯১
৪. সম্পাদকের নাম	:	শুভনীল চৌধুরী
জাতি	:	ভারতীয়
ঠিকানা	:	ফ্ল্যাট-কে-১, ব্লক-৩ ৫০/এ কলেজ রোড পি.ও.-বোটানিক্যাল গার্ডেন হাওড়া ৭১১ ১০৩
৫. প্রকাশের ঠিকানা	:	৩৯এ/১এ, বোসপুকুর রোড কলকাতা-৭০০ ০৪২
৬. স্বত্বাধিকারীর নাম ও ঠিকানা	:	সমাজচর্চা ট্রাস্ট ৩৯এ/১এ, বোসপুকুর রোড কলকাতা-৭০০ ০৪২

আমি তৃষিতানন্দ রায় এতদ্বারা ঘোষণা করছি যে উপরোক্ত বিবরণ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সত্য।

১লা জানুয়ারি, ২০২০ স্বাঃ তৃষিতানন্দ রায়

সমাজ চর্চা ট্রাস্ট

৩৯এ/১এ, বোসপুকুর রোড
কলকাতা-৭০০ ০৪২

১. অশোকনাথ বসু
১২৪/৯/১ প্রিন্স গোলাম হোসেন শাহ রোড
কলকাতা ৭০০ ০৩২

২. তীর্থঙ্কর চট্টোপাধ্যায়
৩৯এ/১এ বোসপুকুর রোড
কলকাতা ৭০০ ০৪২

৩. অভিজিৎ মুখোপাধ্যায়
ফ্ল্যাট ১৬এফ, 'সপ্তপর্ণী'
৫৮/১ বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড
কলকাতা ৭০০ ০১৯

৪. তৃষিতানন্দ রায়
এ. জে. ২৩৪, সেক্টর ২, সল্টলেক
কলকাতা ৭০০ ০৯১

৫. অমিতকুমার রায়
ফ্ল্যাট ৩সি, পুষ্প অ্যাপার্টমেন্ট
৬৩এ ব্রাইট স্ট্রিট
কলকাতা ৭০০ ০১৯

৬. অমিতাভ রায়
ফ্ল্যাট-৪
১৫৭বি, প্রিন্স গোলাম হুসেন শাহ রোড
কলকাতা ৭০০ ০৩২

৭. সুজিত পোদ্দার *কার্যনির্বাহী সদস্য*
এ. কে. ১২৭, সেক্টর ২, বিধাননগর
কলকাতা ৭০০ ০৯১

পাঁচ হাজার টাকা ট্রাস্ট-কে অনুদান দিলে আজীবন 'আরেক রকম'-এর প্রতিটি সংখ্যা বিনামূল্যে পাওয়া যাবে।

আরেক রকম

সম্পাদকীয়

ক্রুদ্ধ হন, জাজমেন্টাল নয়

ছয়ের দশকে প্যারিসে সরকারবিরোধী ছাত্র আন্দোলন যখন তুঙ্গে, তখন বুদ্ধিজীবীরা রাস্তায় নেমে এসেছিলেন বিক্ষোভরত ছাত্রদের সমর্থনে। প্যারিসের রাস্তায় প্রকাশ্যে মাওবাদী পত্রিকা বিক্রির অভিযোগে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন জাঁ পল সার্ত্র। কিন্তু ফ্রান্সের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি শার্ল দ্যু গল সার্ত্রকে সসম্মানে মুক্তি দিয়ে মন্তব্য করেছিলেন, 'রাষ্ট্র কখনো তার ভলতেয়ারকে কারারুদ্ধ করে না।'

ভারতবর্ষের ট্র্যাজেডি হল, তার দক্ষিণপন্থীরা উচ্চাশার কারুকার্যময় ভাস্কর্য নিয়েও ক্ষমতায় ও চরিত্রে নিতান্তই বামন। শার্ল দ্যু গলের মতো হিমালয়প্রতিম চরিত্রও তাদের নেই। তাই এনআরসি এবং সিএএ-র বিরুদ্ধে নাগরিক আন্দোলন যখন তুঙ্গে, তখন আধুনিক ভলতেয়ার নির্মাণের কারখানাস্বরূপ বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ভেতরে তারা পুলিশ ঢুকিয়ে নির্মম রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস নামাতে দ্বিধা করে না। দ্বিধা করে না জামিয়া মিলিয়া বা আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যলয়ের প্রাঙ্গণকে রক্তস্নাত করে তুলতে। রামচন্দ্র গুহ অথবা যোগেন্দ্র যাদবের মতো বুদ্ধিজীবীদের আটক করতে তাদের হাত কাঁপে না। আবার চরিত্রে মুষিকসদৃশ হবার কারণেই স্বীয় কর্মের সমর্থনে অম্লানবদনে একটার পর একটা মিথ্যে বলতেও দ্বিধা করেন না হিন্দুহৃদয়সম্রাট নরেন্দ্র মোদী।

অসম যখন জ্বলছে, নরেন্দ্র মোদী নিজেদের হাত থেকে দায় ঝেড়ে ফেলবার উদ্দেশ্যে মন্তব্য করলেন যে অসমে এনআরসি করতে তারা বাধ্য হয়েছে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে। দলের মধ্যে নাকি এই বিষয়ে এর আগে কোনো আলোচনাই হয়নি। নির্লজ্জ মিথ্যের উপর কর বসে না ঠিকই, তবে মোদী সম্ভবত ইচ্ছে করেই নিজের দলের নির্বাচনি ইস্তাহারের কথাটাও ভুলেছেন। এমনকী ভুলেছেন নিজের কথাও। গত এপ্রিল মাসে মোদী একটি টিভি চ্যানেলকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে নিজেই জানিয়েছিলেন যে এনআরসি হবেই। এই সাক্ষাৎকারের কথা ফাঁস করেছে সংবাদমাধ্যমই। ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনের আগে বিজেপি যে ইস্তাহার ছাপিয়েছিল সেখানে স্পষ্ট করেই তারা লিখেছিল যে অনুপ্রবেশের কারণে দেশের নানা অঞ্চলের জনজাতির চরিত্রে পরিবর্তন এসেছে, এবং সেই কারণে বিজেপি অতি দ্রুত সারা দেশে এনআরসি লাগু করতে বদ্ধপরিকর। মোদী এই দাবিও করেছেন

যে সংসদে নাকি এই নিয়ে আলোচনাও হয়নি। এদিকে ২০ জুন সংসদের দুই কক্ষের মিলিত বৈঠকেই রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ স্পষ্ট জানিয়েছিলেন যে তাঁর সরকার অনুপ্রবেশ অধ্যুষিত অঞ্চলগুলিতে এনআরসি কায়েম করবে এবং সীমান্তকে সুরক্ষিত করবে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বারবার জানিয়েছেন যে প্রথমে সীমান্তবর্তী রাজ্যগুলি এবং পরে সারা দেশে এনআরসি লাগু করবেন তাঁরা, এবং সেটা করবেন সিটিজেন অ্যামেন্ডমেন্ট বিল পাশ হবার পরেই। মোদী বলছেন দেশে নাকি কোনো 'ডিটেনশন ক্যাম্প' নেই। অথচ, তাঁর সরকার সংসদে এক প্রশ্নের উত্তরে জানিয়েছেন (১৯ নভেম্বর, লোকসভা, প্রশ্ন নং: ২৩৪) যে অসমে ৬টি 'ডিটেনশন ক্যাম্পে' ১০৪৩ জন বন্দী রয়েছেন। একই প্রশ্নের উত্তরে সরকার ৩ ডিসেম্বর জানায় ৯৭০ জন অসমের 'ডিটেনশন ক্যাম্পে' রয়েছেন। মোদীর এই নির্জলা মিথ্যে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে বিজেপি আপাতত লজ্জা, সততা, সম্মান, মর্যাদা ইত্যাদি যাবতীয় গুণকে ঝেড়ে ফেলে দিতে বদ্ধপরিকর।

আজ মোদীকে এই মিথ্যেগুলো বলতে হচ্ছে, কারণ বিজেপি বিপদে পড়েছে। সেটাও তাদের নিজেদের কৃতকর্মের কারণেই। অসমে এনআরসি লাগু হবার পর যে ১৯ লক্ষ মানুষ অনাগরিক হয়ে গেলেন, তাঁদের মধ্যে প্রায় ১৪ লক্ষ হিন্দু। বিজেপি তখন থেকেই বলতে শুরু করেছে যে তারা ক্যাব পাশ করিয়ে তারপর এনআরসি প্রয়োগ করবে। সেই মতো বিল পাশ করল তারা। কিন্তু ফলশ্রুতিতে গোটা দেশে এরকমভাবে আগুন জ্বলে যাবে সেটা সম্ভবত তাদের হিসেবের বাইরেই ছিল। বিজেপি হয়তো ভেবেছিল কাশ্মীর অথবা রামমন্দির রায়ের মতো এই পদক্ষেপকেও চাপিয়ে দেওয়া যাবে গায়ের জোরে, এবং কিছুটা সীমিত ক্ষোভ বিক্ষোভের পর মানুষ মেনেও নেবেন। কিন্তু ক্ষোভ যে এভাবে সীমা ছাড়িয়ে যাবে, এটাই হয়তো ভারতীয় গণতন্ত্রের মধুরতম প্রতিশোধ। এই গণতন্ত্র ইন্দিরা গান্ধীর মতো মহাপরাক্রমশালীকেও ক্ষমা করেনি। অটলবিহারী বাজপেয়ীর শাইনিং ভারতবর্ষের স্লোগানকে ছুঁড়ে ফেলে দিতে দুইবার ভাবেনি। এবং যেটা সবথেকে আকর্ষণীয় অধ্যায়, এই অনিয়ন্ত্রিত বিক্ষোভের মধ্যে হিন্দু এবং মুসলমান দুই সম্প্রদায়ই সমানভাবে যোগদান করেছেন। এ কথা ঠিকই যে ক্যাব পাশ হবার পর হিন্দু সম্প্রদায়ের, মূলত উদ্বাস্তু হিন্দু সম্প্রদায়ের বিপদ তুলনামূলকভাবে কম। কিন্তু তা সত্ত্বেও, কলমের একটা খোঁচায় কয়েক কোটি মুসলমান যে অনাগরিক হয়ে যাবেন, এই সম্ভাবনার বিরুদ্ধে একযোগে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়ছেন দুই সম্প্রদায়ের মানুষই। আগামীতে কী হবে জানা নেই। এনআরসি লাগু হলে কত মানুষ তালিকা থেকে বাদ যাবেন, ডিটেনশন ক্যাম্পে যাবেন, তা আমরা কেউ জানি না। কিন্তু যখন ভারতবর্ষের গণআন্দোলনের প্রকৃত ইতিহাস লেখা হবে, তখন এই উজ্জ্বল অধ্যায় স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ থাকবে যে বাবরি মসজিদ অথবা গুজরাত দাঙ্গাই শেষ সত্য ছিল না। তার পরেও এসেছিল ২০১৯।

এই প্রসঙ্গে একটা কৌতুককর অভিজ্ঞতাও সম্প্রতি আমরা করে ফেললাম। ক্যাব পাশ হবার পর পশ্চিমবঙ্গে স্বতস্ফূর্ত গণবিক্ষোভে যখন বাস পুড়ল, ট্রেন অবরোধ হল, এক শ্রেণির উদারনৈতিক এবং মিডিয়ার একটা বৃহৎ অংশ একযোগে গলা ফাটিয়ে তার নিন্দা করতে শুরু করে দিল। ভাবখানা এমন, এরকম হিংসাত্মক আন্দোলন নাকি অন্যায়— আইনসম্মত গণতান্ত্রিক পথ পরিহার করবার মানেই নাকি আন্দোলনের ন্যায্যতা হারিয়ে ফেলা। এমনকী অনেক বামপন্থীও বলতে শুরু করেছেন যে এরকম ধ্বংসাত্মক আন্দোলনের ফলে নাকি বিজেপি সুবিধে পেয়ে যাবে। এঁদের সারল্য দেখে মুগ্ধ হয়ে যেতে হয়। একটি গোষ্ঠীকে গায়ের জোরে তাদের বাসভূমি থেকে বিতাড়িত করা হচ্ছে, আর তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ নাকি আইন মেনে, আবেদন নিবেদনের রাস্তায় হতে হবে। প্রশ্ন করি, শত্রুপক্ষ যদি অহিংস নরমপন্থায় নিবেদিত না থাকে, বিদ্রোহীর কিসের দায় পড়েছে নিয়ম মানার? বিশেষত সেখানে, যেখানে তার জীবন জীবিকা বাসস্থান এবং পরিচিতির প্রশ্ন? উত্তরপ্রদেশে মুসলমানদের ঘরে ঢুকে পুলিশ সর্বস্ব লুঠ করেছে। হিন্দু লেঠেলদের হাতে খুন হয়েছে পুলিশ অফিসার। তখন এই হাহাকার শোনা যায়নি বা যাচ্ছে না।

অদ্ভুত ব্যাপার হল, এই বামপন্থীরাই এককালে ট্রাম বাসের ভাড়া বৃদ্ধির বিরুদ্ধে ট্রাম পোড়ানোর লেগাসিকে সগর্বে বহন করে বেড়িয়েছেন। কিন্তু আজ চোখের সামনে গণআন্দোলন ফেটে পড়তে দেখে তাঁদের বিষম ভয় লাগছে। মনে হচ্ছে একটি বিশেষ গোষ্ঠী যেন এই নাশকতার ঋত্বিক, ঠিক যেভাবে প্রধানমন্ত্রীও বলেছেন যে 'পোশাক দেখেই বোঝা যায় কারা আন্দোলন করছে।' ঠিক একই, বা মাত্রায় এর থেকেও বেশি বিক্ষোভ অসমে হচ্ছে, এবং চরিত্রে সেটি কিয়দংশে বাঙালি বিরোধী। কিন্তু তা সত্ত্বেও সেটাকে নাশকতামূলক মনে হচ্ছে না, তার কারণও হয়তো প্রতিবাদীর ধর্ম। তবে এর থেকেও বড়ো তামাশা হল এমনধারা যুক্তি যে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের

এমনতরো কাজকর্মের ফলে নাকি বিজেপি-র সুবিধে হয়ে যাবে। প্রথমত, বিজেপি-র সুবিধে হয়ে যাবে, এই জুজু দেখিয়ে বহুকাল ধরে তৃণমূল কংগ্রেসের অন্যায়, গুন্ডামি, দুর্নীতি আর অত্যাচারকে সহ্য করিয়ে নিতে বলা হয়েছে। তাতে বিজেপি-র কিছুমাত্র যে অসুবিধে হয়নি সেটাও দেখা গিয়েছে। দ্বিতীয়ত, যেটা একশ্রেণির উদারপন্থীরা বুঝতেই চাইছেন না, যে বিজেপির নতুন করে সুবিধা হবার কিছু নেই। বিজেপি এসেই গেছে। পশ্চিমবঙ্গের মতো তথাকথিত সেকুলার রাজ্যে তাদের ১৮ জন সাংসদ। আর বিজেপি-কে এনেছেন ধর্মীয় সংখ্যাগুরুরাই। কাজেই এখন এই দায় সংখ্যালঘুদের উপর চাপিয়ে দিয়ে হাত ধুয়ে ফেলা অনেকটা নরেন্দ্র মোদীর দায় ঝেড়ে ফেলার মতোই অসংবেদী শোনায়।

কিন্তু একটা কথা ঠিক। এই গণবিক্ষোভ যদি শুধুমাত্র ধর্মীয় অথবা পরিচিতিসত্ত্বার মধ্যেই আবদ্ধ থাকে, তা হলে সেটা বেশিদূর এগোতে পারবে না। কিন্তু তার দায় সংখ্যালঘুদের নয়। দায় বাম ও ধর্মনিরপেক্ষ দলগুলির, তাঁদের পাশে এসে দাঁড়াবার। অন্তত পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থী দলগুলি সহ বহু নাগরিক-উদ্যোগ সেই দায় পালন করছে এখনও পর্যন্ত। ভোটের হিসেবে দুর্বল হয়েও নিয়মিত মিছিল, অবরোধ, বিক্ষোভ প্রদর্শন করে যাচ্ছে। তৃণমূল কংগ্রেসও সম্ভবত এতদিন পরে এই বিপদ সম্পর্কে সচেতন হয়েছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জনসভা করছেন, প্রকাশ্যে মোদীর বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করছেন এ কথা সত্য। এমনকী পশ্চিমবঙ্গই সেই প্রথম রাজ্যগুলির মধ্যে ছিল যারা ঘোষণা করেছিল যে এনআরসি তারা লাগু করবে না। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তাঁকে আরো বেশি সক্রিয় হতে হবে। এনপিআর-কে পুরোপুরি বাতিল করলে তবেই তাঁর সদিচ্ছা প্রমাণিত হবে। আমাদের মনে রাখা দরকার যে মোদীর বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই বনগাঁতে ডিটেনশন ক্যাম্প তৈরির কাজও চলেছিল। লোকসভায় ক্যাব সংক্রান্ত ভোটাভুটির সময়েও তৃণমূলের ৮জন সাংসদ অনুপস্থিত ছিলেন, যাঁদের বিষয়ে কোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থার কথা শোনা যায়নি এখনও। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বর্তমান অবস্থান যেমন প্রাসঙ্গিক, একই সঙ্গে এই প্রশ্নচিহ্নগুলোর উত্তরও তাঁকে দিতে হবে।

অন্যান্য রাজ্যেও বিরোধিতার নতুন পরিসর খুলে যাওয়া আশার সংকেত দেখায়। কেরলে মুখ্যমন্ত্রী বিজয়ন বিরোধী দল কংগ্রেসের সঙ্গে একযোগে ধরনায় বসেছেন, যা চমকপ্রদ সন্দেহ নেই। বড়ো বিপদের আশু মোকাবিলায় ভোটের ময়দানে না হোক অন্তত আন্দোলনের রাস্তায় একজোট হয়ে একপ্রকারের মৈত্রী গড়ে তোলা সম্ভব, সেটা দেখিয়েছেন বিজয়ন। ইতিমধ্যেই ১০টি রাজ্য ঘোষণা করেছে তারা এনআরসি লাগু করবে না। সুর চড়াচ্ছে বিজেপি-র অন্যান্য শরিক দলগুলিও। এই পরিস্থিতিই একটা পরীক্ষামূলক রণনীতির জন্ম দিতে পারে। আঞ্চলিক দলগুলি একজোট হয়ে বিজেপি বিরোধিতায় নামলে তার ফল সুদূরপ্রসারী হবে, সন্দেহ নেই। ঝাড়খণ্ডের সাম্প্রতিক নির্বাচনের ফলাফলে বিজেপি-র ধ্বসে যাওয়া আবার প্রমাণ করেছে যে নির্বাচনি এবং আন্দোলনের ঐক্য হিন্দুত্ববাদের মোকাবিলার একটা কার্যকরী সমাধান হতে পারে। ভারতবর্ষের ফেডারাল কাঠামোকে অক্ষুণ্ণ রাখতে গেলে আঞ্চলিক ধর্মনিরপেক্ষ শক্তিগুলিকে বামেদের সঙ্গে এক ছাতার তলায় আসতে হবে, এবং এই ঐক্যের একটা সূচনা দেখাতে পারে এনআরসি-সিএএ বিরোধী আন্দোলন। সবে লোকসভা নির্বাচন সমাপ্ত হয়েছে। এখনই খুব বেশি প্রত্যাশা করাটা হয়তো দিবাস্বপ্ন হয়ে যাবে। কিন্তু বিজেপি-কে মোকাবিলা করতে গেলে কংগ্রেস যথেষ্ট শক্তি নয়, এমনকী পরিচিতিসত্ত্বার আন্দোলনও নয়, এটা বোঝার সময় এসেছে। শ্রমআইন কার্যকরী করে ভারতবর্ষকে শস্তা শ্রমিকের বাজারে পরিণত করতে চাইছে বিজেপি। অর্থনীতি ধসে যাওয়ার মুখে। লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে রান্নার গ্যাস ও নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির দাম। এনআরসি বিরোধী আন্দোলনের সঙ্গে ভূমিপুত্রদের স্বাধিকার, জাতিসত্ত্বার প্রশ্ন, ধর্ম, বর্ণ এবং সর্বোপরি এই অর্থনৈতিক ইস্যুগুলোকে একসূত্রে বেঁধে ফেলবার এটাই সময়। কারণ অর্থনৈতিক মন্দার সময়ে শ্রমিকের দরকষাকষির ক্ষমতা যত কমানো যায় ততই পুঁজিপতিদের লাভ। এনআরসি চালু করে কোটি কোটি অনাগরিক, যাঁদের শ্রমের বাজারে দরকষাকষির ক্ষমতাই থাকবে না, সেই সব মানুষদের শস্তা শ্রমিকে পরিণত করবার এহেন হিন্দুত্ববাদী অভিপ্রায়টিকেও জনসাধারণের সামনে আনা দরকার। এই সমস্ত ইস্যুগুলিকে একসূত্রে বাঁধতে পারলে তবেই তীব্র হবে ক্ষোভের গতিমুখ। মারণ-আঘাত হানতে পারবে প্রতিক্রিয়ার প্রাণকেন্দ্রে। আর যতদিন না দেশের এক বৃহৎ অংশের ধর্মীয় সংখ্যালঘু মানুষের জীবন জীবিকা বাসভূমির নিরাপত্তার প্রশ্নটির সমাধান হচ্ছে, ততদিন আন্দোলন কোন পথে চলবে এমনধারা জাজমেন্টের চপ্পলটিকে বাইরে খুলে রেখেই সম্ভবত গণমানসের এই রাষ্ট্রবিরোধী ক্ষোভের অন্তর্মন্দিরে প্রবেশ করা উচিত!

মূল্যবৃদ্ধি এবং মন্দা

আগে পেঁয়াজ কাটার সময় চোখ দিয়ে জল বেরোত। এখন পেঁয়াজ কিনতে হবে ভাবলেই সাধারণ মানুষের চোখে জল আসে। কষ্টার্জিত টাকা পেঁয়াজ কিনতে গিয়ে জলের মতো বেরিয়ে যাচ্ছে। বর্তমানে কলকাতা শহর ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে পেঁয়াজের মূল্য কেজি প্রতি ১৪০-১৫০ টাকার আশেপাশে ঘোরাফেরা করছে। অন্যান্য শাক-সবজির দামও আকাশ ছুঁয়েছে। সাধারণ মানুষের কিন্তু বেতন বা রোজগার বাড়েনি। অতএব প্রকৃতভাবে মানুষের ক্রয়ক্ষমতা কমেছে। পেঁয়াজ বা নিত্যপ্রয়োজনীয় সবজির দাম গগনচুম্বী হলে সাধারণ মানুষ খাবে কী? আপাতত, রাজনৈতিক নেতা, বিশেষ করে যাঁরা দেশ চালাচ্ছেন, তাঁরা এই প্রশ্ন নিয়ে খুব বেশি চিন্তিত বলে মনে হচ্ছে না।

যেমন আমাদের প্রধানমন্ত্রী, বণিকসভা অ্যাসোচামের সভায়, বললেন তাঁর সরকার ভারতের অর্থব্যবস্থাকে সংকটের হাত থেকে বাঁচিয়েছে। আপাতত, আর্থিক মন্দা চললেও আমরা নাকি অচিরেই আরো শক্তিশালী অর্থব্যবস্থা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করব। মোদীর এই আশাব্যঞ্জক কথার নেপথ্যে কি কোনো অর্থনৈতিক তথ্য অথবা তত্ত্ব রয়েছে? নাকি তিনি তাঁর স্বভাব মতোই আবারও দেশের মানুষকে বড়ো বড়ো কথা বলে বিভ্রান্ত করতে চাইছেন?

এর উত্তর খুঁজতে হলে আমাদের দুটি প্রবণতা নিয়ে আলোচনা করতে হবে। প্রথম, মূল্যবৃদ্ধির হার, দ্বিতীয় আর্থিক বৃদ্ধির হারের লাগাতার পতন। আমরা আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকেই বুঝতে পারছি যে পেঁয়াজ বা শাক-সবজির ক্ষেত্রে মূল্যবৃদ্ধি প্রবলভাবে বেড়েছে। আমরা যদি খুচরো মূল্যের সূচক বা (Consumer Price Index) সিপিআই-এর দিকে তাকাই তবে দেখা যাবে ২০১৮ সালের নভেম্বর মাসে মূল্যবৃদ্ধির হার ছিল ২.৩৩ শতাংশ, যা ২০১৯ সালের নভেম্বরে বেড়ে হয়েছে ৫.৫৪ শতাংশ। অর্থাৎ, মাত্র এক বছরের মধ্যে মূল্যবৃদ্ধির হার দ্বিগুণের বেশি হয়ে গেছে। এর মধ্যে আমরা যদি শুধু খাদ্যমূল্যের সূচকের দিকে তাকাই তবে দেখা যাবে যে ২০১৮ সালের নভেম্বর মাসে যেখানে মূল্যবৃদ্ধির হার ছিল –২.৬১ শতাংশ, সেখানে ২০১৯-এর নভেম্বর এই হার বেড়ে হয়েছে ২০.০১ শতাংশ, যা ২০১৩ সালের পরে সর্বোচ্চ। অর্থাৎ মাত্র এক বছর আগে খাদ্যের মূল্য ২.৬১ শতাংশ হারে কমছিল যেখানে বর্তমানে তা ১০ শতাংশের বেশি হারে বাড়ছে। খাদ্যের মধ্যে সর্বাধিক মূল্যবৃদ্ধি ঘটেছে শাক-সবজির ক্ষেত্রে যেখানে মূল্যবৃদ্ধির হার নভেম্বর ২০১৯-এ হয়েছে ৩৬ শতাংশ। একই সময় ডালের মূল্যবৃদ্ধির হার ১৪ শতাংশ এবং মাছ মাংসের মূল্যবৃদ্ধির হার ৯.৪ শতাংশ। অর্থাৎ, মানুষের জীবনধারণ করার জন্য যে মৌলিক খাদ্যের দরকার, তার প্রতিটি উপাদানের দাম ব্যাপক হারে বাড়ছে। আমরা আগের সংখ্যার সমসাময়িকে (ক্রয়ক্ষমতার ক্ষয়) লিখেছিলাম যে ২০১৭-১৮ সালের রিপোর্ট অনুযায়ী ভারতের মানুষের খাদ্যের উপর ব্যয় কমেছে গড়ে ৯.৮ শতাংশ। তারপরেও খাদ্যের মূল্যবৃদ্ধি ১০ শতাংশের উপরে থাকলে বুঝতে হবে যে বেশি চাহিদা আছে বলে খাদ্যের দাম বাড়ছে তা নয়। বরং চাহিদা কমেছে। তবু দাম বাড়ছে কারণ বিশেষ বিশেষ পণ্যের ক্ষেত্রে জোগানের সমস্যা রয়েছে। যেমন পেঁয়াজের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র মহারাষ্ট্রে (যেখানে সর্বাধিক পেঁয়াজ উৎপাদন হয়) ৫৮ শতাংশ ফসল অতিবৃষ্টির জন্য নষ্ট হয়েছে। তদুপরি, সরকার ভুল নীতি প্রয়োগ করেছে। দাম যখন বাড়ছিল তখন রপ্তানি নিষিদ্ধ ঘোষিত হলেও আমদানি বাড়াতে সরকার অনেক সময় নেয়। অন্যদিকে এই দামের চড়াই-উতরাই সামলানোর জন্য দীর্ঘমেয়াদি ব্যবস্থা গ্রহণ যেমন ভালো কোল্ড স্টোরেজ নির্মাণ, দাম কম থাকার সময় চাষিদের থেকে পেঁয়াজ কিনে নেওয়া এবং দাম বাড়লে তার একটি অংশ চাষিদের প্রদান করা, এই সব বিষয়ে সরকারের কোনো মনোযোগ নেই।

কিন্তু সমস্ত পণ্যের দাম বাড়ছে না। বরং শিল্পপণ্য বা ম্যানুফ্যাকচারিং পণ্যের মূল্যবৃদ্ধি লাগাতার কমছে। ২০১৯ সালের জুন মাসে ম্যানুফ্যাকচারিং ক্ষেত্রে পাইকারি মূল্যবৃদ্ধির হার ছিল ১.০২ শতাংশ যা নভেম্বর ২০১৯-এ কমে হয়েছে –০.৮৪ শতাংশ। অর্থাৎ, ম্যানুফ্যাকচারিং-এ মূল্যবৃদ্ধির হার ঋণাত্মক হয়ে গেছে। ম্যানুফ্যাকচারিং-এ মূল্যবৃদ্ধির হার নিম্নগামী হওয়ার অর্থ বাজারে চাহিদার সংকট রয়েছে। মনে রাখতে হবে ম্যানুফ্যাকচারিং-এ মূল্যবৃদ্ধি এবং আর্থিক বৃদ্ধির হার উভয়েই নিম্নগামী। তাই বলা যেতে পারে যে চাহিদার সংকটের দরুন উভয়েই কমছে। সুতরাং, ভারতে চাহিদার সংকট থেকে উৎপন্ন আর্থিক মন্দা একদিকে যেমন রয়েছে অন্যদিকে খাদ্যের

মূল্যবৃদ্ধিও রয়েছে জোগানগত সমস্যার জন্য। এখন দুটি প্রশ্ন ওঠে— এক) আর্থিক মন্দার কারণ কী? দুই) সরকার কোন নীতি গ্রহণ করলে সমস্যার সমাধান হবে?

এই প্রশ্নের উত্তর সহজ নয়। আমরা জানি যে ভারতে আর্থিক বৃদ্ধির হার ২০১৯ সালের দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকে গত ছয় বছরে সর্বনিম্ন হয়েছে। কিন্তু শুধুমাত্র এই তথ্যের ভিত্তিতে সমস্যার গভীরতা বোঝা যাবে না। আমাদের আরো কিছু তথ্যের সাহায্য নিতে হবে। যেমন, অক্টোবর মাসে ভারতে বিদ্যুৎ উৎপাদন কমেছে ১৩ শতাংশ, চাহিদার অভাবে ১৩৩টি তাপবিদ্যুৎ ইউনিট বন্ধ করে দিতে হয়। রেলের পণ্য পরিবহন কমে গেছে, কয়লা আমদানি কমে গেছে, পরিকাঠামো শিল্পে বৃদ্ধির হার অক্টোবর মাসে কমে হয়েছে –৫.৮ শতাংশ। একই সঙ্গে কৃষির বৃদ্ধির হার তলানিতে। অতএব বলা যেতে পারে যে ভারতে বর্তমানে যা মন্দাবস্থা রয়েছে তা স্বাভাবিক নয়। বরং তা আরো গুরুতর অর্থনৈতিক ব্যাধির দিকে ইঙ্গিত করছে। এই ব্যাপক মন্দার নেপথ্যে অনেক কারণ রয়েছে যা নিয়ে *আরেক রকম*-এর পাতায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে আগেই। এক কথায় বলতে গেলে বলতে হয় যে মানুষের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পেয়েছে, কারণ চাকরি নেই, সরকারি খরচও করা হচ্ছে না। অন্যদিকে অনাদায়ী ঋণের বোঝা সামলাতে হিমসিম খাওয়া ব্যাঙ্কগুলি আর ঋণ প্রদান করছে না। দুই দিকের এই সমস্যা ভারতের অর্থব্যবস্থাকে তলানিতে নিয়ে ঠেকিয়েছে।

এই পরিস্থিতিতে প্রধানমন্ত্রী নিছক আশ্বাসবাণী শোনাচ্ছেন নিজেদের ব্যর্থতা আড়াল করার জন্য। পৃথিবীর অধিকাংশ অর্থনীতিবিদ মনে করেন ধনীদের কর ছাড় দিলেই আর্থিক বৃদ্ধি সুনিশ্চিত হয় না। অথচ, মোদী সরকার হঠাৎ একদিন কর্পোরেট ক্ষেত্রে ১.৪৫ লক্ষ কোটি টাকা কর ছাড় দিলেন। তারপরেও বেশ কিছু মাস কেটে গিয়েছে কিন্তু অর্থব্যবস্থার হাল ফেরেনি। প্রয়োজন ছিল মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বাড়ানো। ১০০ দিনের কাজ ও অন্যান্য প্রকল্পের মাধ্যমে গরিব মানুষের হাতে সরাসরি টাকা তুলে দেওয়া। কিন্তু তা করা হল না। আর হয়তো হবেও না কারণ মূল্যবৃদ্ধির দোহাই দিয়ে এখন ক্রয়ক্ষমতা কমানোর নীতি গ্রহণ করা হতে পারে। কিন্তু তা সমস্যার সমাধান করবে না। আমরা আগেই বলেছি যে খাদ্যে মূল্যবৃদ্ধি মূলত কিছু ক্ষেত্রের জোগানের সমস্যা যার সঙ্গে ক্রয়ক্ষমতার কোনো সম্পর্ক নেই। অতএব মূল্যবৃদ্ধি এবং মন্দা, উভয়ের সমাধান করতে হলে, একদিকে সরকারি খরচ বাড়াতে হবে, অন্যদিকে কৃষি ও খাদ্য ক্ষেত্রে জোগানের সমস্যার সমাধান করতে হবে।

মোদী মুখে যাই বলুন, এই সমাধান তার সরকার করবে না কারণ তাঁরা অর্থনীতির কিছুই প্রায় বোঝেন না। তার থেকেও বড়ো কথা অর্থনীতি তাদের রাজনীতির মূল আখ্যানের থেকে কয়েক যোজন দূরে। মোদী মানুষকে মন্দির-মসজিদ-হিন্দু-মুসলমান-ক্যা-এনআরসি-র মাধ্যমে ব্যতিব্যস্ত রাখতে চান, সমাজে মেরুকরণ করে তার ফায়দা তুলতে চান। অর্থব্যবস্থার কী হল, তা নিয়ে ওঁর খুব বেশি মাথাব্যথা নেই। কিন্তু সাধারণ মানুষের আছে। ১৫০ টাকা প্রতি কেজি পেঁয়াজ কিনবে মানুষ, ছেলেমেয়ের চাকরি নেই, দারিদ্র্য বাড়ছে, আর্থিক বৃদ্ধি হচ্ছে না, আর তারা শুধু হিন্দু-মুসলমান কোঁদলে মেতে থাকবে তা হয় না। একদিকে যেমন নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন এবং এনআরসি-র সুতীব্র বিরোধিতা করতে হবে, অন্যদিকে মোদী সরকারের ভ্রান্ত অর্থনৈতিক নীতি নিয়েও সংগ্রাম জরুরি। সাধারণ মানুষকে দুটি বিষয়ে একসঙ্গে ঐক্যবদ্ধ করতে পারলে ফ্যাসিবাদকে হারানো সম্ভব।

সমসাময়িক

তরুণ ভারত

২০১৯ সালের প্রথম দিনটি শুরু হয়েছিল চরম দক্ষিণপন্থী বলসোনারোর ব্রাজিলের ক্ষমতাসীন হওয়ার সংবাদে। পরে শুনি আমাজনের অরণ্য পুড়িয়ে দেওয়ার সংবাদ।শুরু থেকেই এরপর একের পর এক ঘটনা/দুর্ঘটনা দেশ বিদেশ জুড়ে।

১৪ ফেব্রুয়ারি সকালের কাগজে পড়লেন ২০ হাজার কোটি টাকা লোপাট প্রভিডেন্ট ফান্ড থেকে। দুর্জনেরা বললেন, এক লাখ ২১ হাজার কোটি টাকার মধ্যে ৯১ হাজার কোটি টাকা জমা ছিল আইএলএফএস-এ। তারা দেউলিয়া ঘোষণা করেছে। ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত বহু সঞ্চয়ী মানুষের। খবর হজম হতে না হতেই বিকেলে খবর এল কাশ্মীরে সেনা কনভয়ে ৪২ জন জওয়ান বিস্ফোরণে নিহত। কারা ঘটাল বিস্ফোরণ, কীভাবে এবং ভবিষ্যতে আর যাতে এমন ঘটনা না ঘটে তার জন্য তদন্ত কমিশন জরুরি। ওইদিন মধ্যরাতেই পাকিস্তানের বালাকোটে হয়ে গেল সার্জিক্যাল আক্রমণ। কতজন মরল সে নিয়ে বিতর্ক চলল— কিন্তু লেখা হয়ে গেল ভারতের নির্বাচনি ভবিষ্যৎ। ৩০২ আসনে বিপুলভাবে জিতল ভাজপা। একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা। শরিকের ওপর নির্ভর নয়। রাজযসভায় যদিও বেশ কম। কিন্তু ইডি, সিবিআই, আয়কর, ঘুষ, পদ ইত্যাদি ব্যবহার করতে ওস্তাদ ভাজপার সভাপতি অমিত শাহ।

নজিরবিহীন সংসদীয় নির্লজ্জতায় কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা বিলোপ করে রাজ্যের অধিকার পর্যন্ত কেড়ে নেওয়া হল। শোনা হল না কাশ্মীরি জনতার স্বর। পাঁচ দিনে সব ঠিক হবে বলার পরও আজও ইন্টারনেট বন্ধ। এই লেখা ছাপা পর্যন্ত ১৪৮দিন বন্ধ ইন্টারনেট। টিভি নেই। কাশ্মীরে কারও এখন হোয়াটস্‌অ্যাপ নেই ১ কোটি ২০ লাখ মানুষ ডিজিটাল ভারতে ইন্টারনেট টিভি সংবাদপত্রের সুবিধাহীন। ১৮ হাজার কোটি টাকার ব্যবসা বন্ধ।

দেশে ঢক্কানিনাদ। জোর রব। ডিজিটাল ভারত। অথচ এদেশে ১৫৩ বার ইন্টারনেট বন্ধ করা হয়েছে সরকারি আদেশে। এগুলো লিখিত। অলিখিত কত কেউ জানে না। এর মাঝে মহারাষ্ট্রের নির্বাচনে বিজেপি শিবসেনা জিতলেও সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়নি। মুখ্যমন্ত্রী পদ নিয়ে টানাটানিতে শিবসেনা বেরিয়ে গেছে ভাজপার কবল থেকে। এক বিপরীতমুখী জোট হয়েছে। শিবসেনা-এনসিপি-কংগ্রেস। মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধব ঠাকরে। জোটের মূল কারিগর বৃদ্ধ শারদ পাওয়ার।

এখনও পর্যন্ত এই সরকারের কাজ ইতিবাচক। রাজনীতির সঙ্গে ধর্মকে মেলানো ঠিক হয়নি বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধব ঠাকরে। দু লাখ টাকা পর্যন্ত কৃষিঋণ মকুব করেছে সরকার। মানতে রাজি হয়নি সংবিধান বিরোধী সর্বনাশা ক্যা আইন। যদিও ক্যাব বিলের পক্ষে লোকসভায় ভোট দিয়েছে তারা। রাজ্যসভায় অনুপস্থিত।

ক্যাতে বলা হয়েছে পাকিস্তান আফগানিস্তান বাংলাদেশ থেকে আগত হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান জৈন পারসিকরা নাগরিকত্ব পাবেন। ২০১৪ এর ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে এলে। মুসলিমরা সেখানে বাদ। বাদ প্রকৃতি পূজারী আদিবাসী সম্প্রদায়। দেশ এরপর প্রত্যক্ষ করেছে এক নজিরবিহীন আন্দোলন ও আন্দোলনে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস। রাজধানী দিল্লিতে জামিয়া মিলিয়ার ছাত, দরিয়াগঞ্জের অধিবাসীদের ওপর নির্মম অত্যাচার পুলিশ ও পুলিশের পোশাক পরা আরএসএস ক্যাডাররা।

ফলে কাশ্মীরে কী ঘটছে সহজেই অনুমেয়।

এরপর দেশ জুড়ে গর্জে ওঠে ছাত্রসমাজ। ভারতের প্রতিটি বড়ো শহরে পঞ্চাশ হাজার থেকে তিন লাখ মানুষের মিছিল হয়েছে। যাতে সিংহভাগ তরুণ তরুণী। অসম, নাগাল্যান্ড, মণিপুর, মেঘালয়, অরুণাচল প্রদেশ— সর্বত্র বিক্ষোভ। অশান্তি। পুলিশের গুলিতে নিহত অসমে ছয় জন।

আর উত্তরপ্রদেশ যেখানে অশান্তি প্রায় হয়নি, সেখানে গুলিতে নিহত ১৯ জন। পুলিশ ও আরএসএস-এর ক্যাডাররা বাইক ভাঙচুর করছে স্কুটারে আগুন লাগাচ্ছে, বাড়ি লুঠ করছে, ৭২ বছরের বৃদ্ধকে পেটাচ্ছে। মুখে বলছে— ‘মুসলিমকে লিয়ে দো স্থান— পাকিস্তান কবরিস্থান’।

১৬৫০০ জন গ্রেফতার।

এদের মধ্যে আছেন একতা আর শেখর নামের এক দম্পতি। যাদের ১৪ মাসের শিশু সন্তান আছে। এই অত্যাচার নিয়ে একটি অনুসন্ধানী দল যায় উত্তরপ্রদেশে। আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের ওপর ‘পুলিশি বর্বরতার’ প্রসঙ্গ তুলে

মানবাধিকার কর্মী হর্ষ মান্দার জানান, মনে হচ্ছে গোটা রাজ্য (উত্তরপ্রদেশ) এক শ্রেণির নাগরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে দিয়েছে। এদিকে 'স্বরাজ ইন্ডিয়া'-র নেতা যোগেন্দ্র যাদব বললেন, উত্তরপ্রদেশে আতঙ্করাজ চলছে তথ্য অনুসন্ধান আয়োগের সদস্য কবিতা কৃষ্ণনও হর্ষ মান্দারের সুরে সুর মিলিয়ে বলেছেন, সিএএ এবং এনআরসি বিরোধী প্রতিবাদ মাটিতে মিশিয়ে দিতে মিথ্যা মামলায় ফাঁসাচ্ছে যোগীর রাজ্যের পুলিশ। কার্যত পুলিশ রাজ চলছে— বলছে হফ পোস্ট।

প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ইরফান হাবিব বলেছেন, আন্দোলনকারীদের এরকম অত্যাচার ব্রিটিশ পুলিশও করেন। স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনা। একজন ব্রিটিশ অফিসারকে মারে ছাত্ররা। ওই অফিসার তবু পুলিশ ডাকেননি। বলেন, এতে শান্তি ফিরবে না। অথচ স্বাধীন ভারতের যোগী পুলিশ বিনা প্ররোচনায় আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকে অত্যাচার ভাঙচুর করেছে।

আলিগড়, জামিয়া— দুই কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ। বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে শুরু হয়েছে ভূতবিদ্যার পাঠক্রম। সেখানে সংস্কৃত শিক্ষকের নাম মুসলিম হওয়ায় তাকে চাকরিতে যোগ দিতে দেয়নি মোদী-শাহ-যোগীর দলের ছাত্র সংগঠন। এখানে প্রতিবাদ হয়েছে। ৫০ জন অধ্যাপক বিবৃতি দিয়েছেন পুলিশি অত্যাচারের বিরুদ্ধে। অজয়কুমার বিস্ট ওরফে যোগী আদিত্যনাথের স্বৈরাচারী শাসনে বিরক্ত হয়ে খোদ বিধানসভা ভবনে ১৫০-র বেশি বিজেপি বিধায়ক ধরনা দিতে শুরু করেন। তা ঢাকতেই পুলিশি অত্যাচার রাজ্যজুড়ে। বলছেন রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা। কিন্তু সেকথা প্রচার করবে কে? দি টেলিগ্রাফ, হিন্দু, আনন্দবাজার এবং কিছুটা জনসত্তা ছাড়া সবাই বিকিয়ে গেছে মোদী-শাহর কাছে। এনডিটিভি স্বাধীনভাবে বহু প্রতিকূলতার মধ্যেও খবর করে যাচ্ছে।

দেশে অঘোষিত সুপার এমার্জেন্সি চলছে। অনেকেই স্বেচ্ছায় সেন্সারশিপ চাপিয়েছেন নিজের ও নিজেদের ওপর। কিন্তু জনতার কণ্ঠস্বর চির অপরাজেয়। এর মাঝে ভারত থেকে আন্দোলনে অংশ নেওয়ায় বহিষ্কার করা হয়েছে জার্মান নাগরিক লিন্ডেনথালকে। প্রশ্ন উঠেছে:

খালি/অক্ষয়কুমার বিদেশি নাগরিক হয়ে বিজেপির বিরুদ্ধে প্রচার করতে পারেন।

অক্ষয়কুমার আয়কর দপ্তরের হয়ে বিজ্ঞাপন করতে পারেন, জার্মান নাগরিক মিছিলে গেলে দোষ?

এদিকে ক্যা এনআরসি বিরোধী আন্দোলনের জেরে মোদী-অমিত শাহ-কে নির্লজ্জ মিথ্যাচার করতে হয়েছে। জনতাকে বিস্মিত করে ২২ ডিসেম্বর মোদী বললেন, বিরোধীরা মিথ্যা প্রচার করছে। এনআরসি-র কথা ওঠেইনি।

যে অমিত শাহ বাঙালিকে উইপোকা, ঘুসপেটিয়া ইত্যাদি বলেছিলেন, তিনি এখন হেঁ হেঁ-তে ব্যস্ত। যে দিলীপ ঘোষ বলেছিলেন, লাশের ওপর দিয়ে এনআরসি হবে— তিনি বলছেন, এসব বলিনি।

আসলে মিথ্যা বলা ওদের চির ঐতিহ্য।

ফ্যাসিস্টদের নির্বাচনি প্রতিশ্রুতি ছিল: প্রতি হাতে কাজ, ২৫% দাম কমানো, ১৫ লাখ করে টাকা দেওয়া, প্রতি ক্ষেতে জল।

পেঁয়াজ মহারাষ্ট্রের চাষি বেচেছিলেন ৫ পয়সা প্রতি কেজি দরে। আপনি কিনতে গেলে দেখছেন ১৫০ টাক কেজি। বেঙ্গালুরুতে ২০০ টাকা কেজি। গত পাঁচ বছরে ২ কোটি লোকের চাররি গেছে। নতুন চাকরি দূরস্থান। বিএসএনএল এর ৭০ হাজার কর্মী বাদ। রেলে চাকরি নেই। তিন লাখ বাদ। জেট এয়ারওয়েজ উঠে গেল, ২৪০০০ কর্মীর কাজ নেই। গর্বের নবরত্ন বেচে ফেলা হচ্ছে। শিক্ষা সেসের টাকা ২ লাখ কোটি আপনি দিয়েছেন। অথচ শিক্ষা ক্ষেত্রে ৩০০০ কোটি টাকা বরাদ্দ কমেছে। ১০ গুণ করে বেতন বাড়ছে ছাত্র-ছাত্রীদের। ম্যানেজমেন্ট পড়াতে পারবেন না কোনো সৎ উপার্জনকারী। আইআইটি-র খরচ বহুগুণ বেড়েছে।

নোট বন্দির ৫০ দিনে সব লাইন উঠে যাওয়া বলার পর সব জায়গায় লাইন। আধার, রেশন কার্ড, ভোটার কার্ড, এনপিআর, এনআরসি। (আবার শুনছি এক দেশ এক কার্ড আসবে)। এখন তো পেঁয়াজের দোকানেও লাইন— যা কখনও ভাবেননি।

কাশ্মীরে সব সমস্যা সমাধান সাত দিনে বলেছিল। ১৪৮ দিন পার। ইন্টারনেট বন্ধ। সব নেতারা জেলে। অসম ৩৫ বছর পর আবার জ্বলছে। ত্রিপুরা মণিপুর মিজোরাম নাগাল্যান্ড সর্বত্র বাঙালি বিদ্বেষ বাড়ছে। ত্রিপুরা অসমে সেনা মোতায়েন বাড়ছে। ইন্টারনেট বন্ধ অসম ত্রিপুরা মণিপুর অরুণাচল প্রদেশে। অবস্থা এমন দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ অরুণাচল প্রদেশ মণিপুর মেঘালয় যেতে ভয় পাচ্ছেন। নিজের রাজ্য গুজরাট পর্যন্ত যেতে পারেননি।

বলেছিল, দেশ ঝুঁকবে না। এখন ভারত আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যমে 'রেপ ক্যাপিটাল অফ দ্য ওয়ার্ল্ড'। একই সঙ্গে অর্থনৈতিক মন্দা ও মুদ্রাস্ফীতি— অভাবনীয়। পেঁয়াজ ১৫০-২০০ টাকা। নতুন আলু ৫০ টাকা। পোস্ত ১৬০০ টাকা। মজুতদারদের সরকার চালাচ্ছে ফ্যাসিবাদীরা।

১১ ডিসেম্বর নাগরিকদের গোপনীয়তা বলে কিছু থাকবে না এমন এক বিল পেশ হয়েছে সংসদে। চাকরির নিরাপত্তা বলে কিছু থাকবে না— এমন বিল আসছে। নতুন অস্ত্র আইনে বাজারে অস্ত্র বাড়বে। বাড়বে খুন জখম হিংসা। ত্রিপুরায় ৬৮১ বিদ্যালয় বেসরকারি হাতে। উত্তরপ্রদেশে শিক্ষকদের বেতন

হচ্ছে না।সুইস ব্যাংক থেকে কালো টাকা আসেনি। সুইস ব্যাংকে উলটে অ্যাকাউন্ট বাড়ছে।

হিন্দু মুসলমান কাশ্মীর পাকিস্তান ছাড়া কোনো কথা নেই। অরুণাচল প্রদেশের ৫০ কিমি ভিতরে ঢুকে পড়েছে চীন। বলেছেন বিজেপি-র সাংসদ। টুঁ শব্দটি নেই।

ক্যাব আরো সর্বনাশ ডাকবে। মেলাবেন।

৩৩ কোটি ৬৬ লাখ জনধন অ্যাকাউন্ট খোলা হয়। বলা হয়েছিল এক পয়সা না থাকলেও চলবে। কিন্তু সেই কথা রাখা হয়নি। মিনিমাম ব্যালেন্স রাখতে না পারায় জরিমানা করা হয়েছে। এতে ১২০০ কোটি টাকা আয় হয়েছে সরকারের। (আর সরকার তা জনকল্যাণে নয়, খরচ করছে মোদীর মুখ দেখাতে ও বিদেশ ভ্রমণে, বিলাস ব্যসনে। সূর্যগ্রহণ দেখার জন্য তাঁর ১৫ মিনিট পরার চশমার দাম এক লাখ ৬২ হাজার টাকা)। আর সরকার রাজ্যসভায় জানুয়ারি মাসে জানিয়েছে ২০% অ্যাকাউন্ট কাজ করছে না। বন্ধ। আর বন্ধ করতে গেলে ৭৫০ টাকা করে গুণাগার দিতে হয়েছে গরিব জনধন অ্যাকাউন্ট থাকা গ্রাহককে। মানুষের থেকে ৭৫০ টাকা করে মারলে কত টাকা মারা হয়?

মিজোরাম নাগাল্যান্ড অরুণাচল প্রদেশের পর মণিপুরে ইনার লাইন পারমিট শুরু হচ্ছে।

দেশের মধ্যে আপনি বিদেশি। এই 'বি-দেশে' কাশ্মীরে বিদেশি দক্ষিণপন্থী সংসদরা যেতে পারবেন, ভারতীয় রাহুল গান্ধী, সীতারাম ইয়েচুরি, ডি রাজারা যেতে পারবেন না।

তবে লোকে যদি মোদী-অমিত শাহ-কে বিদেশে পাঠানোর তোড়জোড় শুরু করে দিয়েছে। দেশজোড়া আন্দোলন ও ধর্মঘট তার প্রমাণ। উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় সাতটি রাজ্য ছাড়াও বিহার গুজরাটে ক্যা আইন বিরোধী সফল ধর্মঘট। ১১টি রাজ্য বলেছে এনআরসি করব না। পশ্চিমবঙ্গ কেরল বলেছে এনপিআর স্থগিত। আর ঝাড়খণ্ডে ব্যাপক ঝড়। বিপুলভাবে হেরেছে। টাকায় সব হয় না— প্রমাণ করে দিয়েছেন ঝাড়খণ্ডের মানুষ। ঝাড়খণ্ডে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সংখ্যা পরিকল্পনা করে কমানো হয়েছে। ৫০% মানুষ এখন ২৬%। ঝাড়খণ্ডে ঝড়ের কারণ: বিনাশ হয়েছে বিকাশ নয়। আদানির স্বার্থে জমি কেড়ে নেওয়া হয়েছে আদিবাসীদের। আপত্তি করলেই মিথ্যা মামলা। গ্রেফতার। ১০০০০ আদিবাসীর বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের মামলা চলছে। গুজরাটের পর যা সর্বোচ্চ। প্রতিবাদী ২০ জন বুদ্ধিজীবীর বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের মামলা।

প্রচণ্ড অর্থনৈতিক সংকট। নতুন চাকরি নেই। কাজ নেই। এমনকী টাটার কারখানায় ছাঁটাই হয়েছে। জিনিসপত্রের দাম বেড়েছে দফায় দফায়। ছোটোনাগপুর, সাঁওতাল পরগনায় আদিবাসীদের জমি না কেনার যে আইন আছে ৩৭০ ধারার মতো। তা তুলে দেওয়ার কথা বলেন এক ভাজপা সাংসদ।

মানুষের স্বাধিকার ছিল না। সব কিছু চাপিয়ে দেওয়া। বিজেপি নেতাদের চরম ঔদ্ধত্য। ক্যা ও এনআরসি-র ভীতি। আদিবাসিন্দাদের বেশিরভাগের জমির দলিল নেই। ছত্তিশগড়ের মুখ্যমন্ত্রী ভুপেশ বাঘেলা ঠিকই বলেছেন, নাগরিকপঞ্জি হলে অর্ধেক বাসিন্দা কাগজ দেখাতে পারবেন না। চরম দুর্নীতি। মানুষকে মানুষ মনে না করা। তোলাবাজি। বিজেপি যে ভোট পেয়েছে তা সামান্য হলেও শতাংশে বেড়েছে। আসাদুদ্দিন ওয়াইসি-র মিম যদি প্রার্থী না দিত এবং প্রায় এক শতাংশ ভোট না ভাগ করে দিত তাহলে বিজেপির আসন ২৫ থেকে কমে ১৫ হয়ে যেতে। তৃণমূল এখানে ২৬টি আসনে প্রার্থী দেয়। পায় ০.৩৬% ভোট।

২০১৪-তে বিজেপি শাসিত রাজ্যের জনসংখ্যা ছিল ৩৯.৮%। পরে ২০১৭-তে তা ৬৭.৮%। বর্তমানে কমে দাঁড়িয়েছে ৪৮.৫৭%। এলাকা হিসেবে ভারতের ৭৩.৯% ছিল বিজেপি শাসিত। বর্তমানে তা অনেক কমে হয়েছে ৩৮.৫%। তবে একটা বিষয় না দেখলে বিপদ বাড়বে ধর্মনিরপেক্ষ শক্তির গ্রামাঞ্চলে বিজেপি-র ভোট বেড়েছে ২.২ শতাংশ (মোট ৩১.৯%)। ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চা কংগ্রেস জোটেরও বেড়েছে ০.০১% (মোট ৩২.৫%)। আধা গ্রামীণ এলাকায় বিজেপি-র কিন্তু কমেছে ০.৭% (মোট ৩৪.৯%)। বেড়েছে ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চা কংগ্রেস জোটের। ১.১% (মোট ৩৮.৪%)। আর আধা শহর এলাকায় বিজেপি-র কমেছে বিপুল –৮.৪% (মোট ৩০.৮%)। জোটের বাড়েনি বা কমেনি (মোট ৪০.৬%)। শহরে উলটো ঘটনা। বিজেপি-র ভোট কমেছে ৪ শতাংশ (মোট ৪০.৪%)। কংগ্রেস জোটের বৃদ্ধি ৪% (মোট ৩৫.৫%)। যেখানে আদিবাসী বাসিন্দা কম, ৩০% এর নীচে সেখানে বিজেপি-র ধস নেমেছে। কমেছে ২.৩% ভোট। ৩০-৫০% আদিবাসী যেখানে থাকেন সেখানে বেড়েছে ১.৫%। আর ৬০% এর বেশি আদিবাসী থাকা এলাকায় বিজেপি-র ভোট বৃদ্ধি ০.৪%। কংগ্রেস জোটের ক্ষেত্রে এটা যথাক্রমে +০.১%, +১.৬%, –০.২%। বিজেপি-র ভোট ৩৯ আসনে কমেছে ২০১৪-র তুলনায়। বেড়েছে ৪০ আসনে।

সমীক্ষা জরুরি কেন এটা ঘটল। আদিবাসী-অ-আদিবাসী মেরুকরণ না আরএসএস-এর বনবাসী পরিষদের নিবিড় সংগঠন। বাড়ি বাড়ি বিস্তারকদের যাওয়া, টাকা বিলি, বিদ্বেষ প্রচার— নাকি অন্য কিছু। পশ্চিমবঙ্গে বাইরে থেকে ৩০ হাজার বিস্তারক আসছে। তারা বাড়ি বাড়ি যাবে। এ নিয়ে ধর্মনিরপেক্ষ শক্তিকে ভাবতে হবে। শুধু মিটিং মিছিল পদযাত্রা দিয়ে মোকাবিলা করা যাবে না। হুইস্পারিং ক্যাম্পেন খুব জরুরি। বিজেপি কী কী ধ্বংস করেছে জানাতে হবে— পরিকল্পনা কমিশন, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, নির্বাচন কমিশন, সিবিআই,

আইবি, ইডি, নিরপেক্ষ মিডিয়া, সংবিধান, বিচারব্যবস্থা, প্রতিবেশীর সাথে সুসম্পর্ক, প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে সম্পর্ক, অর্থব্যবস্থা, আমলাদের মনোবল, এবং সেনাবাহিনীর রাজনৈতিক সম্পর্কহীনতা। ভারতে সেনাবাহিনীর প্রধান এনাআরসি-ক্যা-বিরোধী গণআন্দোলনের বিরুদ্ধে কথা বলেছেন ২৬ ডিসেম্বর। কথায় কথায় পাকিস্তানকে বিরোধী সাজানো ফ্যাসিবাদীরা পাকিস্তানের মতোই 'ফৌজি কালচার' চালাতে চায়। এদের চিন্তাতেই 'হিন্দু পাকিস্তান'। গণতন্ত্রহীন সাম্প্রদায়িক শাসন। আফগানিস্তানের তালিবানদের মতো ধ্বংস করতে চায় ভাস্কর্য। বাবরি মসজিদের পর লক্ষ্য তাজমহল, কুতুব মিনার ইত্যাদি। আদানি আম্বানির স্বার্থে পরিচালিত এই সরকার চায়, হিন্দু রাষ্ট্র নয়, 'চোরপরেট' ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্র বানাতে।

তবে সুখের কথা এই দেশ জাগছে। আমরা ব্যঙ্গ করে বলতাম নিউ ইন্ডিয়া, নতুন ভারত— তবে এখন এটা ইতিবাচক অর্থ নিয়ে হাজির।

ওদের নতুন ভারতে ওরা হিন্দু মুসলিম ভাগ করতে চেয়েছিল। তা উলটে জুড়ে দিয়েছে। পাকিস্তানে চলে গিয়েছিলেন ৪.৬৯ কোটি মুসলিম। হিন্দু সম্প্রদায়ের ভরসা রেখে অথবা ভিটের টানে থেকে গিয়েছিলেন বেশি সংখ্যক মানুষ— ৪.৮৯ কোটি। পূর্বপুরুষদের মান রেখেছেন নতুন প্রজন্ম লাখে লাখে তাঁরা রাস্তায় নেমেছেন। শুধু জেএনইউ-যাদবপুর নয়, ভারতের টাটা সমাজ গবেষণা কেন্দ্র (টিস) সহ সব আইআইটি নেমেছে রাস্তায়। সব কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়। মধ্যপ্রদেশের ভূপাল শুনিয়েছে বিজেপি-র সন্ত্রাসী নেত্রীকে শ্লোগান— সন্ত্রাসবাদী দূর হটো—।

কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র রজত সিংহ ক্যা, এনপিআর এবং এনআরসি-র প্রতিবাদে ডিগ্রি নিলেন না— যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন মঞ্চে ক্যা আইনে ছিঁড়ে ছাত্রী তুললেন হজরত মোহানির দেওয়া শ্লোগান— ইনকিলাব জিন্দাবাদ, এটাই আসল ধর্মনিরপেক্ষ ভারত। এই ভারত তরুণ ভারত।

এনপিআর নিয়ে অবস্থান স্পষ্ট করুন মুখ্যমন্ত্রী

এনআরসি এবং নাগরিক সংশোধনী আইন নিয়ে গোটা দেশ তোলপাড়। হাজার হাজার ছাত্র-যুব পথে নেমেছেন ভারতের ধর্মনিরপেক্ষ সংবিধানকে বাঁচাতে, এই বার্তা দিতে যে মহাত্মা গান্ধী, রবীন্দ্রনাথ, মৌলানা আবুল কালাম আজাদের দেশে ধর্মের ভিত্তিতে মানুষে মানুষে বিভাজন মানা যাবে না। ভারতের ভবিষ্যৎ কোনদিকে যাবে তা নির্ভর করছে এই আন্দোলনের গতিপ্রকৃতির উপর।

আন্দোলনের সামনে সরকার যথারীতি নির্লজ্জ। একদিকে জামিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের উপর নামিয়ে আনা হয়েছে ভয়াবহ আক্রমণ, শুধু উত্তর প্রদেশে পুলিশের গুলিতে ১৯ জন নিহত, ব্যাঙ্গালুরুতে গ্রেপ্তার করা হয় ইতিহাসবিদ রামচন্দ্র গুহকে। অন্যদিকে সরকারের দ্বিতীয় কৌশলটি হল লাগাতার মিথ্যা কথা বলে মানুষকে বিভ্রান্ত করা। একদিকে প্রধানমন্ত্রী বলছেন যে এনআরসি নিয়ে নাকি কোনো আলোচনাই হয়নি। অন্যদিকে অমিত শাহ বলছেন যে এনপিআর-এর সঙ্গে নাকি এনআরসি-র কোনো সম্পর্ক নেই। প্রধানমন্ত্রীর মিথ্যা ভাষণের স্বরূপ আমরা উন্মোচিত করেছি এই সংখ্যার সম্পাদকীয়তে। এই নিবন্ধে আমরা আলোচনা করব এনপিআর এবং এনআরসি-র মধ্যের সম্পর্ক নিয়ে।

প্রথমেই বলতে হয় যে অমিত শাহ ডাহা মিথ্যা কথা বলছেন। তাঁর সরকার একাধিকবার সংসদে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করেছে যে এনআরসি-র প্রথম ধাপ এনপিআর। ২০১৪ সালের ৮ জুলাই একটি প্রশ্নের জবাবে তৎকালীন গৃহদপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন যে এনপিআর প্রক্রিয়ার যুক্তিপূর্ণ ফলশ্রুতি হবে এনআরসি, যেখানে ভারতে বসবাসকারী প্রত্যেক বাসিন্দার তথ্য প্রথমে এনপিআর-এ নথিবদ্ধ করা হবে এবং তারপরে সেই তথ্য থেকে প্রত্যেকের নাগরিকত্ব যাচাই করা হবে। ২৩ জুলাই আবার একই বিবৃতি মন্ত্রিমশাই রাজ্যসভায় পেশ করেন। ২০১৪ সালের ২৯ নভেম্বর কিরেন রিজিজু দ্যর্থহীন ভাষায় জানান যে এনআরসি-র প্রথম ধাপএনপিআর। ২০১৬ সালের ১১ নভেম্বর কিরেন রিজিজু রাজ্যসভায় আবার বলেন যে এনপিআর তৈরির প্রক্রিয়া এনআরসি তৈরির প্রক্রিয়ার অঙ্গ, যা ২০০৩ সালের নাগরিকত্ব আইনের বিধি মেনে করা হবে। কাজেই এখন যদি কেউ বলে যে এনপিআর এবং এনআরসি-র মধ্যে কোনো সম্পর্ক নেই, তবে সে নির্ভেজাল মিথ্যার আশ্রয় নিচ্ছে।

অমিত শাহ একাধিক সাক্ষাৎকারে বলেছেন যে এনপিআর এবং এনআরসি নাকি ভিন্ন আইনের ভিত্তিতে তৈরি হবে। আবার তিনি মিথ্যা বলেছেন। ১৯৫৫ সালের নাগরিকত্ব আইন ২০০৩ সালে সংশোধন করা হয়। এই নতুন আইনের বিধিতে এনপিআর এবং এনআরসি দুইয়েরই উল্লেখ রয়েছে। এই আইনের বিধি সংখ্যা তিনে লেখা রয়েছে যে কেন্দ্রীয় সরকার চাইলে জনসংখ্যা পঞ্জি বা এনপিআর তৈরি করবে, যেখানে ভারতে বসবাসকারী সমস্ত মানুষের তথ্য সংবলিত হবে। এরপরেই বিধি সংখ্যা পাঁচে বলা হচ্ছে, স্থানীয় নাগরিকপঞ্জিতে

সমস্ত নাগরিকের তথ্য থাকবে এনপিআর-এর তথ্য যাচাই করার পরে। বিধি সংখ্যা চারে বলা হচ্ছে যে এনপিআর-এ সংবলিত তথ্যের মধ্যে স্থানীয় আধিকারিকরা সন্দেহভাজন নাগরিকদের চিহ্নিত করবেন। এই সন্দেহভাজন নাগরিক কীভাবে নির্ধারিত হবে তার কোনো প্রক্রিয়ার উল্লেখ নাগরিকত্ব আইন ২০০৩-এর বিধিতে লিপিবদ্ধ করা নেই। তা হলে কি স্থানীয় আধিকারিক এবং বিজেপি-র কর্মীরা স্থানীয়ভাবে নিজেদের মতো সন্দেহভাজন নাগরিক চিহ্নিত করবেন? মূল এনপিআর-এ নথিবদ্ধ নাগরিকদের মধ্যে থেকে সন্দেহভাজন নাগরিকদের বাদ দিলেই খসড়া এনআরসি তৈরি হয়ে যাবে। ৩১ জুলাই ২০১৮, কেন্দ্রীয় সরকার এনপিআর-এর বিজ্ঞপ্তি জারি করে নাগরিকত্ব আইন ২০০৩-এর ভিত্তিতেই। এই আইনেই এনআরসি তৈরি হবে। এখন যদি গৃহমন্ত্রী বলেন যে এনপিআর এবং এনআরসি ভিন্ন আইনে তৈরি হবে, তবে তিনি মিথ্যা কথা বলছেন।

সরকার এনপিআর প্রক্রিয়া শুরু করে দিয়েছে। ইতিমধ্যেই ৩৯৪১ কোটি টাকা এই খাতে বরাদ্দ করা হয়েছে। অন্যদিকে সরকার বলার চেষ্টা করছে যে এনআরসি আপাতত হচ্ছে না। কিন্তু এনপিআর সরকারের মতে এবং ২০০৩-এর নাগরিকত্ব আইনের মতে যেহেতু এনআরসি তৈরি করার প্রথম ধাপ, তাই বলা যেতে পারে যে এনআরসি করছি না বলে, এনপিআর চালু করে সরকার মানুষকে বিভ্রান্ত করছে, যেখানে এনপিআর-এর মাধ্যমেই এনআরসি তৈরি হবে। তাই এনআরসি আটকাতে হলে এনপিআর প্রক্রিয়া আটকাতেই হবে। একবার এনপিআর শুরু হয়ে গেলে, নাগরিকদের হাতে আর কিছু থাকবে না। এনপিআর-এ নথিবদ্ধ তথ্যের ভিত্তিতে সরকার সন্দেহভাজন নাগরিক চিহ্নিত করে এনআরসি-র খসড়া তালিকা তৈরি করে নেবে। যাদের নাম বাদ যাবে তারা বাধ্য হবে বিভিন্ন নথি জমা দিয়ে নিজেদের নাগরিক প্রমাণ করার। এর সঙ্গে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন ২০১৯ বলবৎ হলে যাঁরা শেষ অবধি নাগরিকত্ব পাবেন না তাঁদের মধ্যে অ-মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষ নাগরিকত্ব পেতে পারেন যদি তাঁরা বাংলাদেশ, পাকিস্তান বা আফগানিস্তান থেকে আগত বেআইনি অনুপ্রবেশকারী হিসেবে নিজেদের পরিচিতি দেন। কিন্তু মুসলমানদের নাম বাদ গেলে তাঁদের নাগরিকত্ব পাওয়া প্রায় অসম্ভব হয়ে যাবে। তাই বলা যেতে পারে ব্যবহারিক দিক দিয়ে দেখলে এনআরসি বিরোধী আন্দোলনের প্রধান দাবি হওয়া উচিত এনপিআর-কে স্থগিত করা, যেহেতু এনপিআর-এর মাধ্যমেই এনআরসি তৈরি হবে।

ইতিমধ্যেই কেরল এবং পশ্চিমবঙ্গের সরকার এনপিআর প্রক্রিয়াকে স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়ে এই মর্মে বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে। কিন্তু কেরল এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিজ্ঞপ্তি দুটি ভিন্ন প্রকারের। কেরল সরকার বিজ্ঞপ্তিতে স্পষ্টভাবে বলেছেন যেহেতু নাগরিকত্ব আইন ২০০৩-এ বর্ণিত আছে যে এনপিআর প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই এনআরসি হবে তাই তাঁরা এই কার্যাবলি স্থগিত রাখছেন। এই বিজ্ঞপ্তিতে সই করেছেন কেরল সরকারের মুখ্যসচিব। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের বিজ্ঞপ্তিটি আইনের চোখে নিতান্তই খাটো। এর দুটি কারণ রয়েছে। প্রথমত, এই বিজ্ঞপ্তি জারি করেছেন জনগণনা বিভাগের একজন জুনিয়র আধিকারিক। দ্বিতীয়ত, এই বিজ্ঞপ্তিতে ২০০৩ সালের নাগরিকত্ব আইনের কোনো উল্লেখই করা হয়নি। বলা হয়েছে যে রাজ্যের শান্তি-শৃঙ্খলা বজার রাখার জন্যই নাকি এনপিআর প্রক্রিয়া রদ করা হল। ২২ ডিসেম্বর কলকাতার টেলিগ্রাফ পত্রিকায় খবর বেরোয় যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এনপিআর প্রক্রিয়া রাজ্যের বর্তমান অশান্তির জন্য সাময়িকভাবে স্থগিত রেখেছে, বাতিল করেনি। একজন বরিষ্ঠ সরকারি আধিকারিক প্রতিবেদককে জানান যে এনপিআর প্রক্রিয়া সাময়িকভাবে বন্ধ রাখা হয়েছে। সরকার কখনোই বলেনি আমরা এনপিআর প্রক্রিয়া রাজ্যে করব না। আপাতত আইন-শৃঙ্খলার অবনতির জন্য প্রক্রিয়াটি বন্ধ রাখা হলেও পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে সরকার তার সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করবে। অর্থাৎ, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এনপিআর-এর বিরুদ্ধে কোনো স্পষ্ট অবস্থান নেই। মাননীয়ার ছবি সংবলিত একাধিক বিজ্ঞাপন আমরা দেখেছি যেখানে তিনি জনগণকে বলছেন নথি সংগ্রহ করতে এবং জনগণনা প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে। কিন্তু বিতর্ক জনগণনা নিয়ে কখনোই ছিল না। বিতর্ক ছিল এনপিআর নিয়ে, যার বিরুদ্ধে কোনো সুস্পষ্ট অবস্থান মাননীয়া নেননি।

মুখ্যমন্ত্রী একাধিক মিছিল-মিটিং করছেন। কিন্তু এনপিআর প্রক্রিয়া বন্ধ না করলে তাঁর যাবতীয় আস্ফালন মিথ্যা প্রমাণিত হবে। যদি তিনি সত্যিই এনআরসি বিরোধী হন তবে অবিলম্বে ঘোষণা করুন যে এনপিআর প্রক্রিয়া রাজ্যে হবে না। বিজ্ঞপ্তি জারি করুন মুখ্যসচিবের তরফে যেখানে স্পষ্টভাবে এই কথা উল্লেখিত থাক। তা যদি না করেন তবে বুঝতে হবে এনআরসি-র বিরুদ্ধে মুখ্যমন্ত্রী তথা রাজ্যসরকারের আন্তরিকতার অভাব রয়েছে। এনপিআর-এনআরসি বিরোধী আন্দোলনে কোনো মধ্যপথ নেই। হয় আপনি এনপিআর-এনআরসি-র সমর্থক অথবা বিপক্ষে। ভারতের অসংখ্য মানুষের নাগরিকত্ব কেড়ে নেওয়ার ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে আন্দোলন দোদুল্যমানতার ভিত্তিতে হতে পারে না। রাজ্য সরকার যদি সুস্পষ্টভাবে এনপিআর-এর বিরুদ্ধে রাজনৈতিক এবং প্রশাসনিক অবস্থান না নেন, তবে আন্দোলন তাঁদের বিরুদ্ধেও হবে। এনপিআর-এনআরসি বাতিল করার লক্ষে সমস্ত শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে শামিল হবেন এই আশা আমাদের আছে।

বরিসের ব্রিটেন বিজয়

আমরা, মানে *আরেক রকম*-এর পাঠকরা, তাঁর নাম শুনিনি বোধহয়, কিন্তু ২৬ বছর বয়স্ক স্টর্মযি ব্রিটেনের একজন স্বনামধন্য গায়ক-গীতিকার-সুরকার। তবে গত কয়েকদিন তিনি শিরোনামে উঠে এসেছেন সম্পূর্ণ রাজনৈতিক কারণে। এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলে ফেলেছিলেন যে ব্রিটেনে বর্ণ বৈষম্য প্রবল। আসলে তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয় ব্রিটেনে বর্ণ বৈষম্য আছে কি না। উত্তরে স্টর্মযি বলেন, আলবত, একশো ভাগ আছে। ব্যস, আর যায় কোথায়। নিন্দুকেরা এর ব্যাখ্যা করেন যে তিনি বলেছেন ব্রিটেনের একশোভাগ মানুষই বর্ণবাদী। ছি ছি করে ওঠে সোশাল মিডিয়া। পরে অবশ্য ভুল সংশোধন করা হয়, স্টর্মযিও সংবাদমাধ্যমকে এক হাত নেন কিন্তু আসল কাহিনি সেটা নয়। আসল কাহিনি হল বরিস জনসন ও তাঁর কন্সার্ভেটিভ দলের মেদিনী কাঁপানো জয়ের পর ব্রিটেনে বর্ণ বৈষম্য আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। তার সঙ্গে যোগ করুন যে স্টর্মযি নিজে কৃষ্ণাঙ্গ ও পরাজিত লেবার দলের ঘোষিত সমর্থক, এবং পেয়ে যাবেন আজকের ব্রিটেনের নানা টানাপোড়েনের একটি ক্ষুদ্র প্রতিরূপ।

ব্রেক্সিট তিনি করেই ছাড়বেন, এটাই ছিল বরিস জনসনের মরণপণ প্রতিজ্ঞা যা এনে দিয়েছে ভোটের এই প্লাবন। মুশকিল হল ব্রেক্সিট শুধু ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের বিরুদ্ধে জেহাদ নয়। ব্রেক্সিটের পিছনে রয়েছে ব্রিটেনের হৃত গৌরব ফিরে পাওয়ার এক মূর্ত বাসনা, যে ব্রিটেনের সাম্রাজ্যে সূর্য ডুবত না সেই ব্রিটেনের জন্যে আর্তি এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, যে ব্রিটেনে রাজত্ব করবে শুধু শ্বেতাঙ্গরাই। ২০১৬-য় ব্রেক্সিট নিয়ে গণভোটের ফলাফলে যখন দেখা গেল যে ব্রিটেনের অর্ধেকের বেশি লোক ব্রেক্সিটের পক্ষে তখনই কালা আদমিদের ওপর আক্রমণ হু হু করে বেড়ে যায়। তারপর, ব্রেক্সিট নিয়ে গত কয়েক বছরের টালবাহানায় একটু রেহাই পাওয়া যায় ঠিকই কিন্তু এখন, বরিসের এই বিশাল জয়ের পর কী হবে কে জানে। ২০১৬-য় তো ব্রেক্সিটবাজরা টায়ে টুয়ে জিতেছিল, কিন্তু এখন তো দেখা যাচ্ছে শুধু কন্সার্ভেটিভ দলের সমর্থক নয়, ব্রেক্সিট তথা বরিসের পক্ষে ভোট দিয়েছে আজন্ম লেবার সমর্থকরাও।

এমনকী ভারতীয় বংশোদ্ভূত কালা আদমিরাও। তবে তারা ব্রেক্সিটের আশায় বরিসকে বেছে নিয়েছে তা অবশ্য কেউ বলছে না। বরং ব্রিটেনের ভালোর কথা ভেবে নয়, তারা নাকি ভোট দিয়েছে ভারতের ভালোর কথা ভেবে। তাই তারা লেবারকে প্রত্যাখ্যান করেছে ভারতের রাজনীতির কারণে। লেবার দল এবং বিশেষ করে তাদের নেতা জেরেমি কর্বিন কাশ্মীর নিয়ে মোদী সরকারের কীর্তিকলাপের, ৩৭০ ধারা বিলোপ ইত্যাদির সরাসরি ও তীব্র নিন্দা করেন। এতে খুব গোঁসা হয় প্রবাসী ভারতীয়দের। অবশ্য তার জন্য আমাদের কেন্দ্রের শাসক দল যথেষ্ট কাঠখড় পুড়িয়েছিল এ কথাও অনস্বীকার্য। ভারতীয় জনতা পার্টির 'বিদেশে বিজেপি-র বন্ধু' নামে একটি সংস্থা আছে এবং তারা এ দেশে রপ্ত কায়দায় ওখানেও হোয়াটস অ্যাপে ভিডিও বিতরণ করে, লেবার দলকে পাকিস্তানের প্রতিনিধি আখ্যা দিয়ে, নানা মিথ্যা, অর্ধসত্য বা কিছু সত্যও প্রচার করে ওখানকার ভারতীয়দের মগজ ধোলাইয়ের সবরকম চেষ্টা করে। ঝোপ বুঝে কোপ মারেন ইটন-অক্সফোর্ডে পড়া, পাক্কা ইংরেজ বরিস জনসনও। লন্ডনের গুজরাতিদের গর্বের স্বামীনারায়ণ মন্দিরে নির্বাচনি প্রচারে গিয়ে বরিস 'নরেন্দ্র ভাইয়ের' ভূয়সী প্রশংসা করেন, সাহায্যের আশ্বাস দেন এবং জিতলে যথাশীঘ্র ভারতে আসার ইচ্ছাও প্রকাশ করেন।

ইস, ব্রাজিলের বলসানারোকে ২৬ জানুয়ারির নিমন্ত্রণ পাঠানো হয়ে গেছে, না হলে জনসনই আমাদের প্রজাতন্ত্র দিবস আলো করতে পারতেন। কিন্তু তাতে ভারতের আদৌ কোনো সুবিধা হত কি না কে জানে। এটা ঠিক যে বরিস জনসন আগামী ৩১ জানুয়ারিতে ইউরোপের সঙ্গে বিচ্ছেদ সম্পন্ন করবেনই করবেন। কিন্তু তারপর শুরু হবে আসল খেলা। কেননা তারপরই ব্রিটেনকে বিশ্বের প্রতিটি দেশের সঙ্গে আলাদা আলাদা বাণিজ্যিক ও অন্যান্য চুক্তি সই করতে হবে। নিয়মমাফিক তার জন্যে তিনি এগারো মাস সময় পাবেন, ২০২০-র ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত। কিন্তু সকলেই মনে করে যে এই বিস্তৃত ও জটিল কাজের জন্য এগারো মাস খুবই অল্প সময়। এবং বলাই বাহুল্য ব্রিটেন প্রথমে আমেরিকা, ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন ও ওই রকম বড়ো বড়ো অর্থনীতির দিকে নজর দেবে। কিন্তু সবুরেও মেওয়া কতটা ফলবে সন্দেহ। বাণিজ্যিক চুক্তি হলেও ভারত নিশ্চয় প্রতিদানে ব্রিটেনের কাছে ভিসার বিধিনিষেধ শিথিল করার দাবি করবে। অন্তত করা তো উচিত। কিন্তু অভিবাসীর সংখ্যা হ্রাস করা তো ব্রেক্সিটবাজদের একটা বড়ো চাহিদা এবং কন্সার্ভেটিভ দল তো অভিবাসনের নিয়মকানুন আরো কড়া করার অঙ্গীকার করে বসে আছে।

আমরা অবশ্য বরিসের মন্ত্রিসভায় ভারতীয় চেহারার দু-তিনজনকে দেখেই আনন্দে আত্মহারা। গর্বে আমাদের বুক ফুলে উঠেছে যে প্রীতি প্যাটেল ব্রিটেনের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। মজার কথা হল, অমিত শাহের প্রতিরূপ প্রীতি প্যাটেল অভিবাসনের ব্যাপারে আমাদের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর মতোই কট্টর। বস্তুত, এই বিষয়ে

কাঠিন্যের পরিচয় দিয়ে আগের জমানাতেই নাম কিনেছেন প্রীতি প্যাটেল। শোনা যাচ্ছে ইনফোসিসের প্রতিষ্ঠাতা নারায়ণ মূর্তির জামাতা ঋষি সুনাকের নাকি পদোন্নতি হবে, তাঁকে অর্থনীতির ক্ষেত্রে আরো একটা বড়োসড় কোনো পদ দেওয়া হবে। অবশ্য অর্থমন্ত্রী যদি সাজিদ জাভেদই থাকেন, এবং তিনি যদি পূর্বপুরুষদের পাকিস্তানকে অনুগ্রহ করতে চান তবে দড়ি টানাটানি মন্দ হবে না।

তবে এ সবই নিছকই সুখস্বপ্ন। আমরা তাঁদের সাফল্যে আহ্লাদে আটখানা হতে পারি কিন্তু প্রীতি প্যাটেল বা ঋষি সুনাক বা তাঁদের মতো সকলেই নিজেদের আগে ব্রিটিশ পরে ভারতীয় ভাবে। এবং ব্রিটেনের সামনে এখন বহু সমস্যা। যেমন, স্কটল্যান্ড। সেখানকার মানুষ ব্রেক্সিট চায় না এবং তাদের প্রবক্তা, স্কটিশ ন্যাশনাল পার্টি, এই নির্বাচনে খুবই ভালো ফল করেছে। তারা তো ইতিমধ্যেই স্বাধীনতার জন্য গণভোটের দাবিও করে ফেলেছে যদিও নব নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন তার অনুমতি দেবেন এমন আশা কেউ করছে না। প্রায় একই চিত্র নর্দার্ন আইয়ারল্যান্ডে, যদিও সেখানকার ছবিটা আরো পরিষ্কার হবে ব্রেক্সিট লাগু হবার পর। তাই প্রশ্নটা শুধু গ্রেট ব্রিটেন ফের গ্রেট হতে পারে কি না তাই নয়; শেষ পর্যন্ত যুক্তরাজ্য যুক্ত থাকে কি না সেটাই দেখার।

নিবেদন

আমরা সময়ের বিপক্ষে দাঁড়ানোর চেষ্টা করে *আরেক রকম*-এর দাম গত ৭ বছর একই রেখেছিলাম, ২০ টাকা। কিন্তু অস্তিত্ব বজায় রাখার তাগিদে পত্রিকার দাম এই সংখ্যা থেকে ৩০ টাকা করতে হচ্ছে। এই সঙ্গে বাৎসরিক গ্রাহকচাঁদা হবে ৭০০ টাকা। আশা করি পাঠকসমাজের সহমর্মিতা থেকে এই পত্রিকাটি বঞ্চিত হবে না।

সমস্ত প্রকার সামাজিক ও নৈতিক অধঃপতনের বিরুদ্ধে বামপন্থা, সাম্য, প্রগতি ও যুক্তিবাদী মানসিকতার স্বার্থে পত্রিকাটি প্রকাশ করে যেতে আমরা বদ্ধপরিকর।

সম্পাদকমণ্ডলী

আরেক রকম

আটে পা

আটে পা দিল *আরেক রকম*। ২০১৩ সালের ১ জানুয়ারি থেকে নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে এই পত্রিকা। ২০১১ পরবর্তী পশ্চিমবঙ্গে যে রাজনৈতিক ও সামাজিক অবক্ষয় আমরা প্রত্যক্ষ করছি তার বিরুদ্ধে এক ঋজু ও চিন্তাশীল আলোচনার ক্ষেত্র তৈরি করাই অশোক মিত্র ও তাঁর সহযোগীদের উদ্দেশ্য ছিল।

আজ সাত বছর সম্পূর্ণ হওয়ার সময় আমরা এক জটিল সাম্প্রদায়িক ও বিভেদের রাজনীতির সম্মুখীন। একদিকে কোটি কোটি মানুষের নাগরিকত্ব কেড়ে নেওয়ার চক্রান্ত, অন্যদিকে অর্থব্যবস্থা ধ্বংসের মুখে। প্রগতিশীল ও বাম শক্তিরা কিছুটা দিশেহারা। এমতাবস্থায় *আরেক রকম*-এর দায়িত্ব বাড়ল। আমরা স্বৈরাচার, সাম্প্রদায়িকতা, শোষণ, জাতি-ধর্ম-লিঙ্গ ভিত্তিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে এবং গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, সাম্য ও মৈত্রীর পক্ষে প্রগতিশীল চিন্তাধারার চর্চা নিয়মিত চালিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর।

পত্রিকা প্রকাশ ও পরিবেশনের খরচ বেড়ে যাওয়ার ফলে আমরা পত্রিকার দাম বাড়াতে অনিচ্ছাসত্ত্বেও বাধ্য হয়েছি। আশা করি পাঠকেরা আমাদের পাশে থেকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবেন।

আমাদের পাশে থাকার জন্য পাঠক, লেখক, চিত্রশিল্পী, বিজ্ঞাপনদাতা, পরিবেশক এবং ছাপাখানার বন্ধুদের আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

—সম্পাদক

আরেক রকম

ছবি : মনোজ দত্ত

এক মেষ-নাগরিকের আত্মবীক্ষা

অনুরাধা রায়

ইদানীং নিজেকে বেশ ভেড়া-ভেড়া মনে হয়। ভেড়ার পাল তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছেন মেষপালক। 'হ্যাট, হ্যাট,' 'ব্যাঙ্কে লাইন দিয়ে নোট জমা দে।' 'হ্যাট, হ্যাট, আধার কার্ড বানাতে হবে। লাইন লাগা।' 'হ্যাট, হ্যাট, আবার লাইন লাগা— নাগরিক পঞ্জিতে নাম লেখাবি চল।' রোদে জলে, খেয়ে না-খেয়ে, খোঁড়াতে খোঁড়াতে, হাঁপাতে হাঁপাতে, বাঁচতে চেয়ে এবং মরতে মরতে কাগজের গোছা হাতে লাইন লাগানো। কাগজের খসখসানি যেন কানে মেষপালকের হাতের পাঁচনবাড়ির শব্দ। কখনো তা হাওয়ায় আস্ফালিত হয়, কখনো পিঠে পড়ে। কাগজের লেবেল গলায় ঝুলিয়ে দিয়ে মেষপালক মেষদের চিহ্নিত করেন। তা নইলে তিনি তাদের ওপর নজরদারি করবেন কী করে? আর তারাই বা বাধ্যতা/নিয়মানুবর্তিতা/ সুনাগরিকত্ব শিখবে কী করে? আমাদের মেষপালক সর্বশক্তিমান। রাখতে চাইলে রাখতে পারেন, মারতে চাইলে মারেন। কাকে ঘাস খাওয়াতে নিয়ে যাবেন, কাকে খোঁয়াড়ে পুরে রাখবেন, কার পশম কেটে নেবেন, কাকে কেটে খাবেন— সে তাঁরই মর্জি। পাঁচনবাড়ি কখনো বন্দুকের নল হয়ে গুলি চালায়, কখনো ছুরি হয়ে গলা কাটে। এই হল মেষ-রাষ্ট্রের মেষ-নাগরিকদের হাল হকিকত। গোরুরা অবশ্য এখানে অপেক্ষাকৃত ভালো আছে।

ফুকো, আগামবেনদের বক্তব্য এমন হাড়ে হাড়ে আগে কখনো বুঝিনি। মানুষ মানে তো মন নয়, আত্মা নয়; ভালো-লাগা, ভালোবাসা, ক্রোধ, ঘৃণা, কান্নাহাসির দোলদোলানো কোনো অস্তিত্ব নয়। মানুষ একটা জৈববস্তু, যাকে নিয়ন্ত্রণ করা শাসকের দায়িত্ব। বিষয়ী থেকে বিষয়ে পরিণত করে মানুষকে নিয়ন্ত্রণের জন্য নানান প্রযুক্তি শাসকরা আবিষ্কার ও ব্যবহার করেন। এই প্রক্রিয়াকেই বলা হয় biopower/biopolitics (জৈবক্ষমতা ও তার রাজনীতি)। লিবারেল তথা উদারনীতিবাদী রাজনীতি এর একটা আধুনিক ধরন প্রতিষ্ঠা করেছিল। ফুকোর মতে, 'It shapes rather than takes life.' অর্থাৎ মুণ্ডচ্ছেদ বা শূলে চড়ানোর খুব একটা আর দরকার নেই, বরং 'ডিসিপ্লিন' করো। হ্যাঁ, ডিসিপ্লিন মানে শাস্তিও বটে। কথাই তো আছে— 'দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন'। পালন দিয়ে দমনকে সহনীয় করো। গণতন্ত্র/প্রজাতন্ত্রের যুগ বলে কথা! সার্বভৌমত্ব এখন জনগণের তথা তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে। এখন তাই 'প্রজাতন্ত্র' বললেও 'প্রজা' আর বলে না, 'নাগরিক' বলে। এখন কি আর প্রকাশ্যে দমনপীড়ন চালানো যায়! তাতে অবশ্য অসুবিধে কিছু নেই! দুনিয়াটা জাতিরাষ্ট্রের সীমারেখা দিয়ে বিভাজিত হয়ে এখন শাসকদের শাসনের পরিসর খুব নির্দিষ্ট। প্রজা থুড়ি নাগরিকদের পালাবার পথই নেই। তাদের ওপর শাসকের দখল আরোই জোরদার— আইনকানুন, পুলিশ, মিলিটারি ও আরো নানান প্রযুক্তির দৌলতে। মাঝে মাঝে ধর্মীয় কারণে (যেমন ধরা যাক, 'জাতীয়তাবাদ' নামে যে আধুনিক ধর্ম) তাদের বলি দেওয়া হবে— এও গ্রাহ্য। 'সবকা সাথ সবকা বিকাশ' অর্থাৎ সার্বিক মঙ্গলের জন্যেই তো চলছে গোটা ব্যবস্থাটা। তাই জনমতের সমর্থন এর পিছনে আছে বই কী! আসলে এ তো শুধু রাজনীতি নয়, অর্থনৈতিক তাগিদও যে জড়িয়ে আছে এর সঙ্গে। আধুনিক যুগের শিল্পভিত্তিক ধনতন্ত্রের সর্বোচ্চ লাভের লক্ষ্যপূরণে সাধারণ মানুষ তো 'রিসোর্স' বই নয়; পণ্যও বলা যায়। সেই অনুযায়ী তো আজকের আঁটঘাট-বাঁধা বায়োপলিটিক্স। এমন সুচারু একটি ব্যবস্থা না হলে যে দমনপীড়নের রাজনীতি নিজের নৈতিক ও অর্থনৈতিক অসংগতির চাপে নিজেই ভেঙে পড়ত, যেমন পড়েছিল সোভিয়েত রাশিয়ার গুলাগ ব্যবস্থা।

এই বায়োপাওয়ারকে ফুকোই বলেছিলেন 'pastoral power' (চারণক্ষেত্রের ক্ষমতা), কারণ it 'treated the vast majority of men as a flock and a few as shepherds'। আধুনিক 'discipline and control' পদ্ধতি প্রয়োগ করার জন্য বিরাট সংখ্যক মানুষকে কীভাবে অবমানবে, পশুতে পরিণত করা হয়, কখনো এমনকী সরাসরি পশু/কসাইখানা/ শিকারের উপমা ব্যবহার করা হয় তার জন্য, সেটা বারে বারেই ইতিহাসে দেখা গেছে। অন্যদিকে তামিলনাড়ুতে পশুচারণের

পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে আনন্দ পাণ্ডিয়ান দেখিয়েছেন, মানবসমাজে শাসন ও দমনের নিয়মকানুনও কীভাবে সেখানে সত্যিকারের পশুচারণের সংস্কৃতির সঙ্গে জড়িত। সেই ঔপনিবেশিক যুগ থেকেই সেখানকার কাল্লারদের 'ক্রিমিনাল ট্রাইব' বা 'অপরাধপ্রবণ জনজাতি' বলে দেগে দিয়ে অনেকটা পশুদের মতো করেই তাদের ওপর নজরদারি ও নিয়ন্ত্রণের উদ্যোগ নেওয়া হয়; তারাও সেটা নিজেদের মঙ্গল ও উন্নতির সূচক বলে মেনে নেয়।

এইভাবেই আধুনিক পশুচারণ ব্যবস্থা দিব্যি চলে। মেষপালক আর মেষদের মোটামুটি সহাবস্থান, সহযোগিতা বজায় থাকে। একেক সময়ে কিন্তু একেকজন মেষপালক বড়ো বেশি ক্ষমতা-মদমত্ত হয়ে ওঠে। হয়তো সে প্রযুক্তি-তুখোড়ও বটে। তার ওপর আই-টি সেক্টরের প্রশিক্ষিত প্রযুক্তিবিদদের সহায়তা পেলে তো কথাই নেই! ক্ষমতার নতুন নতুন প্রযুক্তির ফাঁসে পশুদের ধরেবেঁধে শাসন করতে চায় সে। তবে বেশি বাড়াবাড়ি করলে অসংগতি প্রকটিত হয়, গোল বাঁধে; যেমন আজকের ভারতবর্ষে। ফুকোর 'প্যাস্টোরাল পাওয়ার' যেন আজ সারা ভারতের চারণক্ষেত্রের সব সবুজকে কেড়ে নিচ্ছে। মানবাত্মা বুভুক্ষু, তারচেয়েও জরুরি সমস্যা ক্রমবর্ধমান পেটের খিদে। অনেক ভেড়া অবশ্য দেখছি তাতেই বেশ খুশি। তাদের সবুজ ঘাসের বদলে গেলানো হচ্ছে জাতীয়তাবাদের বড়ি। জাতির সংহতি, জাতির আইন-শৃঙ্খলা, জাতির উন্নয়ন, জাতির মর্যাদার সুখস্বপ্নে বিভোর হয়ে আছে তারা। জাতিরাষ্ট্র নামে এক বিরাট শক্তিশালী যন্ত্রের অংশ হতে পেরে তারা উৎফুল্ল, উল্লসিত। জাতীয়তাবাদ মানুষকে মেষ কেন, একেবারে অসাড় জড়পদার্থে পরিণত করতে পারে। সজীব বৃক্ষকে করতে পারে শুষ্কং কাষ্ঠং গাছের গুঁড়ি। রবীন্দ্রনাথ কবেই তাঁর *Nationalism* বইটিতে জাতীয়তাবাদগ্রস্ত মানুষদের সম্পর্কে বলেছিলেন— 'Turn a tree into a log and it will burn for you, but it will never bear living flowers and fruit.' ('একটি গাছকে কাঠের গুঁড়িতে পরিণত করো। সে তোমার জন্য জ্বলবে, কিন্তু ফল-ফুল আর দেবে না')। আসলে কিনা দাপুটে জাতীয়তাবাদ চরিতার্থতা পায় শত্রুনিধন করে— বাইরের শত্রু, ভেতরের শত্রু। তার শামিল হয়ে মানুষের নিজেকে বেশ বীর-বীর মনে হয়, সম্মোহন গাঢ়তর হয়। মেষপালক যদি কিছু মেষকে বোঝাতে পারে যে, পালের জন্য কিছু মেষ তাদের থেকে বড্ড অন্যরকম, সুতরাং তাদের শত্রু, এবং সেই শত্রুদের জন্যেই তাদের জীবনে সবুজ ঘাসের অভাব, তখন মানুষ-থেকে-মেষ-হওয়া প্রাণীগুলি একেবারে কাষ্ঠে পরিণত হয়ে হুহু করে জ্বলে ওঠে, চতুর্দিকে আগুন লাগায়। আজকের ভারতে সেই আগুন জ্বলছে।

কিন্তু এই আগ্রাসী পশুচারণ চলবে কি বেশিদিন? গুলাগের মতোই ভেঙে পড়বে না ভেতর থেকে? কিংবা তার অপরিসীম ঔদ্ধত্য তাকে নাৎসি জমানার মতো অনিবার্য ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাবে না? জাতিরাষ্ট্র নামে বায়োপাওয়ার নিজেই যে এক বিকট জন্তু হয়ে ওঠে, যার অনৈতিক অতিলোভ তাকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথের *Nationalism* থেকেই আবার তুলনা দিই— 'Man with his mental and material power for outgrowing his moral strength, is like an exaggerated giraffe whose head has suddenly shot up miles away from the rest of him, making normal communication difficult to establish. This greedy head, with its huge dental organization, has been munching all the topmost foliage of the world, but the nourishment is too late in reaching his digestive organs, and his heart is suffering from want of blood.' ('মানুষের মানসিক আর পার্থিব শক্তি তার নৈতিক শক্তিকে যদি অনেক দূর ছাপিয়ে যায়, তা হলে সে একটা অতিকায় জিরাফের মতো হয়ে যায়— যে জিরাফের মাথাটা তার বাদবাকি শরীর থেকে অনেক মাইল তফাতে চলে গিয়ে শরীরের মধ্যেকার স্বাভাবিক যোগাযোগ-প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করে। তার লোভী মুন্ডুটা, তার বিরাট দাঁতের পাটি দুনিয়ার সবচেয়ে উঁচু লতাপাতা চিবিয়ে চলেছে বটে, কিন্তু তার পাচনযন্ত্রে পুষ্টি পৌঁছচ্ছে অনেক দেরি করে এবং তার হৃৎপিণ্ড রক্তের অভাবে ধুঁকছে।')। এরকম একটা ভারসাম্যহীন ব্যবস্থা তো আর বেশিদিন টিকতে পারে না। বোঝা দরকার, কিছু মানুষকে বহিষ্কার বা নিকেশ করলেই যে অন্য মানুষরা ভালো থাকবে তা নয়। তারাও তো অপুষ্টি ও রক্তাল্পতায় ভুগতে ভুগতে দ্রুত এগিয়ে যাবে মৃত্যুর দিকে। তা ছাড়া, আজ যারা মেষপালকের 'হ্যাট হ্যাট' তাড়নায় পড়িমরি হয়ে ছুটতে ছুটতে ভাবছে, তাদের তো নয়, কসাইখানায় নিয়ে যাওয়া হবে শত্রু-মেষদের, তাদেরও অনেকে যে কসাইখানায় পৌঁছবে না এবং এক কোপে তাদেরও গলা কাটা পড়বে না, 'প্যাস্টোরাল পাওয়ার'-এর বন্দোবস্তিতে এমন নিশ্চয়তাও কিন্তু নেই। সুখস্বপ্ন যে অনায়াসে দুঃস্বপ্নে পরিণত হতে পারে, অসম তা দেখিয়ে দিয়েছে।

এতক্ষণ ধরে প্রধানত মেষের তুলনা দিয়ে গেলাম বটে, কিন্তু মনে মনে একটু ভরসা আছে যে, আসলে 'মানুষ আমরা, নহি তো মেষ'। না, 'Silence of the Lambs'-এর গল্প আমরা লিখছি না, আমরা প্রতিবাদ করছি। মানুষ প্রতিবাদ করছে। কদিন আগে কাশ্মীর নিয়েও যে চেতনা জাগেনি, প্রতিবাদ হয়নি, আজ নিজের ঘরে আগুন লাগার সম্ভাবনায় তা দেখতে

পাচ্ছি। কখনো শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ, কখনো উন্মত্ত, হিংস্র। হিংস্রতা কাম্য নয়, তা নিজেদেরই ক্ষতি করে। হয়তো অনেক ক্ষেত্রে এটা নিছক চিন্তাহীন গুন্ডামি। তবে শোনা যাচ্ছে, পাথর-ছোঁড়া, ট্রেনে-বাসে আগুন ইত্যাদি নাকি প্রায় ক্ষেত্রে শাসকপক্ষ থেকেই সংঘটিত (হতেই পারে; হিটলারও তো ষড়যন্ত্র করে রাইশট্যাগে আগুন ধরিয়ে ছিলেন)। আর জামিয়া মিলিয়ার ছাত্রদের শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ দমনেও তো শাসক-প্রেরিত পুলিশের হিংস্রতা আমরা দেখলাম। কিন্তু আন্দোলনের পদ্ধতি নয়, আমি আপাতত প্রতিবাদের চিন্তাভিত্তির কথাই ভাবছি। চিন্তাটাকে একটু মূলগত স্তরে নিয়ে যেতে চাইছি। আমাদের এই স্বঘোষিত 'সার্বভৌম সমাজতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক' প্রজাতন্ত্রে, যেখানে ধর্মের ভিত্তিতে কোনো পক্ষপাত নিতান্ত অবৈধ, যেখানে সার্বভৌমত্ব আসলে প্রতিটি মানুষে নিহিত, সেখানে যদি আমার একজনও কোনো সহনাগরিকের সার্বভৌমত্ব অস্বীকার করা হয়— সে ধর্মের জন্যেই হোক, বা নিছক কাগুজে কারণে, যদি মানুষটির জন্য নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয় ডিটেনশন-খাঁচার এক টুকরো শীতল ভূমি, যদি এই উন্মুক্ত পৃথিবীর আলো-বাতাস থেকে বঞ্চিত করে আমার সহমানব কাউকে নিষ্করুণ মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেওয়া হয়, অর্থাৎ মানুষ প্রায়শ পশুর সঙ্গে যে ব্যবহার করে তেমনই যদি করা হয় তার সঙ্গে, তবে অবধারিতভাবেই আমার মনে পড়ে যায় দেরিদার কথা (সেই দেরিদা, যে উত্তর-আধুনিক চিন্তকের নাম সচরাচর ফুকোর সঙ্গে উচ্চারিত হয়)। যে কথাটা তিনি বলেছিলেন মানুষের পশু-সংক্রান্ত (অ)নৈতিকতাকে চ্যালেঞ্জ করে, তারই অনুসরণ করে বলব— গায়ের জোরে, বা সংখ্যার/চালাকির/অর্থের জোরে যদি পিছিয়েও থাকি, আমাদের দুর্বলতা তুচ্ছতা ও মরণশীলতা, যাতে আমাদের সকলের অংশীদারি, তা দিয়েই নির্ধারিত হোক আমাদের সকলের সার্বভৌমত্ব। অন্তত মৃত্যু ব্যাপারটা তো প্রত্যেকের নিজস্ব, অনন্য। এবং এই 'singularity of all deaths', এটাই যেন আমাদের প্রত্যেককে প্রতিটি অন্য ব্যক্তির অনন্যতা ও সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে সচেতন করে তোলে, তার প্রতি নৈতিক দায়িত্ব পালনে প্রাণিত করে। যেন সহনাগরিকদের জীবনের মূল্য সম্পর্কে শ্রদ্ধাবান করে এই বোধ জাগায় আমাদের মনে— 'সকলের তরে সকলে আমরা, প্রত্যেকে আমরা পরের তরে'। এইভাবেই যেন আমরা নিষ্ঠুর যথেচ্ছাচারী শক্তিমান শাসককে প্রতিরোধের উদ্যোগ নিই; তার লম্বাচওড়া নীতিগত বা আইনি প্রতর্কের, তার পাইক-পেয়াদার মোকাবিলা করার জোর পাই। দেরিদা কেন, গান্ধীর দেশের নাগরিক আমরা, গান্ধীর কথাও তো স্মরণ করতে পারি আজকের এই সংকট মুহূর্তে (অবশ্য শাসক আজ গান্ধীকে দখল করার চেষ্টায় আছে, আমাদেরও প্রমাণিত হওয়া পর্যন্ত নিজেদের নাগরিক বলে দাবি করার অধিকার নেই!)। অসংবেদী শাসকের মোকাবিলায় একটা সংবেদনশীল মানবিক চিন্তার উৎস থেকেই তৈরি হোক আমাদের নাগরিকদের দিক থেকে নৈতিক বায়োপলিটিক্স। নৈতিক ভিতটা মজবুত থাকলে আন্দোলনের কৌশলগত অভিমুখ সঠিকভাবেই খুঁজে পাওয়া যাবে বলে মনে হয়। এবং আশা করি, অসমে আটক লক্ষ লক্ষ অসহায় মানুষকে মুক্ত করে তবেই এই আন্দোলনের সমাপ্তি ঘটবে।

রাজভবন বনাম নবান্ন: ডুবছে উচ্চশিক্ষা

পার্থপ্রতিম বিশ্বাস

অবশেষে রাজ্যের সরকার বনাম রাজ্যপালের সংঘাতের রাজনীতির চোরাস্রোত ঢুকে পড়ল বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার ক্ষেত্রেও। সেই সংঘাতের সঙ্গে এবার জড়িয়ে পড়ল বিশ্ববিদ্যালয় স্বশাসনের রীতি, রেওয়াজ এবং নিয়মকানুন। সম্প্রতি বিধানসভায় রাজ্যের সরকার পাস করিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার নতুন বিধি। শিক্ষা পরিচালনার স্বার্থে, নতুন বিধি, নতুন আইন এ সমস্ত চালু করার প্রাথমিক দায় রাজ্য সরকারেরই। কিন্তু কেমন বিধি পরিবর্তনে শিক্ষার স্বার্থের চেয়ে যদি রাজনৈতিক স্বার্থে বেশি প্রয়োজন হয় তবে সে আইন একুশে আইনের গেরো হয়েই ঝুলতে থাকবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাথার ওপর এ নিয়ে সন্দেহ নেই। কোনো সন্দেহ নেই যে রাজ্যপাল ও রাজ্য সরকারের প্রাত্যহিক বিবৃতির সংঘাত ও বিনিময় এ রাজ্যে সংসদীয় রাজনীতির মানমর্যাদার পরিপন্থী হয়ে উঠছে। এমনকী কোনো সন্দেহ থাকা উচিত নয় যে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় রাজ্যের রাজভবন বা বিকাশভবন কোনোটিরই নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠানের শ্রীবৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করে না। এই প্রেক্ষিতে রাজ্যপাল ও রাজ্য সরকারের আশু সংঘাতের আবহে তৈরি হওয়া এই বিধি পরিবর্তনে শেষমেষ শাসকের নিয়ন্ত্রণের রাজনীতিই আরো জাঁকিয়ে বসবে বলে আশঙ্কা।

এ দেশে প্রথম স্বীকৃত যে রাজ্যের রাজ্যপালই সাধারণভাবে রাজ্য সরকার পরিচালিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলির আচার্যের ভূমিকা পালন করে থাকেন। মূলত কমনওয়েলথ দেশগুলিতে চালু প্রথা অবলম্বন করেই এ দেশে স্বাধীনতার পরেও এই আচার্যের পদটিকে খানিকটা আলংকারিক অর্থেই বহাল রাখা হয়েছিল। এই প্রেক্ষিতে দেখলে বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনায় আচার্যের আদেশের পরিবর্তে মুখ্যত পরামর্শদানই ছিল তাঁর কর্তব্য। সেই কারণেই প্রতিষ্ঠান পরিচালনার দৈনন্দিন কাজে আচার্যের অংশগ্রহণের আইনি সুযোগ নেই। সাধারণভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারক সংস্থার সভায় তার সভাপতিত্বের সুযোগ রয়েছে। তার অধিকারের মধ্যে রয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের সামগ্রিক উপাধি প্রাপকদের নাম চূড়ান্ত করার, সমাবর্তনে দীক্ষান্ত ভাষণ প্রদান। এ ছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়ের স্ট্যাটুট বা অর্ডিনান্সের মতো বিধি প্রণয়ন বা পরিবর্তনে তার চূড়ান্ত সম্মতি প্রদানের অধিকার আইনস্বীকৃত ছিল। নতুন এই বিধি পরিবর্তনে বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য এই সমস্ত অধিকার থেকেই বঞ্চিত হলেন।

কোনো সন্দেহ নেই বর্তমান রাজ্যপাল আচার্য হিসেবে আইন না ভাঙলেও প্রথাগত বহু রীতি রেওয়াজ যে ইতিমধ্যে ভেঙে ফেলেছেন তা নিয়ে সন্দেহ নেই। সাম্প্রতিককালে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে ছাত্রদের ঘেরাও মুক্ত করতে তিনি যেভাবে ক্যাম্পাসে সরাসরি চলে গিয়েছিলেন তা এককথায় বেনজির ঘটনা। এমনকী মন্ত্রীকে ঘেরাও-মুক্ত করতে আচার্য হিসেবে উপাচার্যকে ক্যাম্পাসে পুলিশ ডাকার যে নিদান তিনি দিয়েছিলেন সেটিও বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনায় রীতি বিরুদ্ধ। এমনকী বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে রাতের অন্ধকারে দুর্গাবাহিনীর তাণ্ডবে তাঁর নীরবতা ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে উদ্ধারে তাঁর অতি সক্রিয়তা নিঃসন্দেহে রাজনৈতিক পক্ষপাতিত্বের প্রশ্ন তুলতেই পারে। ফলে আচার্য তাঁর নির্ধারিত গণ্ডির বাইরে বেরিয়ে লক্ষ্মণরেখা ভাঙছেন কিনা এ বিতর্ক সহিষ্ণুতার সঙ্গেই সামলানো উচিত। কিন্তু রাজনৈতিক ক্ষমতার সমীকরণে রাজভবনকে ক্ষমতার বৃত্তের বাইরে রাখতে গিয়ে বিকাশভবনে যাবতীয় ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বাধিকারে বাড়তি বিপদ হয়ে উঠবে এ নিয়ে সন্দেহ নেই।

বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন বিধিতে আচার্যের ক্ষমতাকে ঠুঁটো জগন্নাথে পরিণত করা হয়েছে। চিঠিতে প্রস্তাবিত আচার্যের অফিস তুলে দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যদের আচার্যের পরিবর্তে যাবতীয় বিধিপত্রের আদান প্রদান বিকাশভবনে রাজ্যের শিক্ষা দপ্তরের সঙ্গে করতে হবে। পাশাপাশি আচার্যের কোনো পরামর্শ এখন থেকে সরাসরি উপাচার্যকে না জানিয়ে সেগুলি রাজ্যের শিক্ষা দপ্তরে পাঠানোর সুপারিশ রয়েছে। আচার্যের পরামর্শ রাজ্যের সরকার সমীচীন মনে করলেও তবে সেটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠানোর প্রস্তাব করা হয়েছে নতুন এই বিধিতে। গত কয়েক দশকের চালু প্রথা ও আইন মেনে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারক সংস্থার সুপারিশকেই চূড়ান্ত গণ্য করা হত বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্মানিক ডিগ্রিপ্রাপক বা

অতিথিদের নামের তালিকা গ্রহণে। কিন্তু এই বিধি পরিবর্তনে বিশ্ববিদ্যালয়ের চূড়ান্ত নামের তালিকায় প্রয়োজন হবে রাজ্যের সরকারেরও। এমন বিশুদ্ধ বৌদ্ধিক বিষয়ে সরকারের সম্মতি যে বাড়তি নিয়ন্ত্রণের স্বার্থেই তা দিনের আলোর মতো পরিষ্কার। দু বছর আগের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ন্ত্রণ আইনের পরিশিষ্ট হিসেবে বা হাজির হয়েছে তাতে পরিষ্কার প্রবেশিকা থেকে সিলেবাস, নিয়োগ থেকে গবেষণা সবেতেই শাসকের নিয়ন্ত্রণের দাপট বেড়ে চলেছে ফি বছর। গত আট বছরে এ রাজ্যে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বহু নতুন আইন তৈরি হলেও সেই আইন চালুর প্রয়োজনীয় বিধির স্ট্যাটুট আজও তৈরি হয়নি কোনো বিশ্ববিদ্যালয়েই। এই স্ট্যাটুট তৈরির দায়ভার ছিল বিশ্ববিদ্যালয়গুলির কোর্ট কাউন্সিল বা সিনেট সিন্ডিকেটের ওপরেই। আর বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই খসড়া বিধি চূড়ান্ত অধিকার ন্যাস্ত ছিল আচার্যের ওপরই। এই বিধি পরিবর্তনে আচার্যের সেই অধিকার খণ্ডিত হয়ে তা চলে গিয়েছে রাজ্যের শিক্ষা দপ্তরে। পুরোনো বিধিতে আচার্য রাজ্যপাল হওয়ার কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের খসড়া প্রস্তাবে তাঁর সম্মতির মধ্যে একটা সরকারি সমঝোতার সূত্র লুকিয়ে থাকলেও কখনোই তা সরাসরি সরকারি নিয়ন্ত্রণের পথ ছিল না। বলাই বাহুল্য এই নতুন বিধিতে স্বাধিকারের ভাবনা আক্রান্ত হল। উপাচার্যরা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোর্ট বা সেনেটের সভা ডাকবেন কিন্তু সেই সভায় সভাপতিত্ব করার কথা যে আচার্যের তার বিধি বিকাশভবন হয়ে রাজভবনে পৌঁছোবে তাও রাজ্য সরকার মনে করলে! এমন বিধি যে আচার্য পদের প্রতি কেবল অসৌজন্যের নিদর্শন তাই নয় সেটি আইন বিরুদ্ধও বটে।

প্রস্তাবিত এই একুশে আইনের বাঁধনে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা পড়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যদের স্বাধীনতাও। এখন থেকে লেখাপড়ার প্রয়োজনে বা ব্যক্তিগত প্রয়োজনে বিশেষ সফরে গেলে তাদের দলবেঁধে অনুমতি নিতে হবে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তর থেকে। সফর সেরে দেশে ফিরে সফরের অভিজ্ঞতা সংবলিত রিপোর্ট জমা দিতে হবে সরকারকে। এখানেই আইনি প্রশ্ন তৈরি হচ্ছে যে বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো স্বশাসিত সংস্থার প্রধান উপাচার্যকে কেন সরকারের অনুমতি নিতে হবে দেশ ছাড়ার আগে? প্রচলিত আইনে উপাচার্যরা ছুটি নিলে আচার্যকে জানিয়ে তাদের দায়িত্বভার সহ উপাচার্যকে অর্পণ করেন প্রতিষ্ঠান পরিচালনার স্বার্থে। বিশ্ববিদ্যালয়ের দৈনন্দিন কাজকর্মে এতদিন রাজ্যের সরকার বা আচার্যের হস্তক্ষেপের তেমন সুযোগ ছিল না। কিন্তু এই নতুন বিধিবলে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাত্যহিক কাজে সরকারি হস্তক্ষেপের সূত্রপাত হল। এবার আশঙ্কা নতুন বিধিতে উপাচার্যের স্বাধিকার যদি বিসর্জিত হয় সরকারি কর্মীর ধাঁচে সেক্ষেত্রে স্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের স্বাধীকারও পর্যায়ক্রমে বিসর্জিত হবে সন্দেহ নেই। এ রাজ্যে ২০১১ সালে সরকার বদলের পর তৈরি নতুন আইনে উপযুক্ত কারণে উপাচার্যদের সরিয়ে দেওয়ার অধিকার রয়েছে আচার্যের হাতেই। অথচ আচার্যের ডানা ছাঁটার লক্ষে উপাচার্যদের অপসারণের উপযুক্ত কারণ তদন্ত করার অধিকার নতুন বিধিতে রাজ্যের শিক্ষা দপ্তরের ওপরে ন্যাস্ত রয়েছে। বার্তা পরিষ্কার যে প্রতিষ্ঠানের মাথাকে নিয়ন্ত্রণ করে প্রতিষ্ঠানের লেজ নাড়ানোর ব্যবস্থা অবধি সেরে ফেলতে চাইছে সরকার নিয়ন্ত্রণের এই নতুন বিধিকে সঙ্গী করেই।

নতুন বিধিতে শুধু প্রতিষ্ঠানের স্বাধিকার নয় আচার্যের স্বাধিকারও ক্ষুণ্ণ করা হয়েছে নগ্নভাবেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য নিয়োগের সার্চ কমিটি, শিক্ষক নিয়োগ কমিটি অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোর্ট-কাউন্সিলের মতো কমিটিতে আচার্যের নিজস্ব প্রতিনিধি পাঠানোর অধিকার রদ করে এখন থেকে রাজ্য সরকারের পাঠানো তিনটি নামের তালিকা থেকেই আচার্যকে তার প্রতিনিধি নির্বাচন করতে হবে। কাল বিধি পরিবর্তনে আরো স্পষ্ট হচ্ছে সরকারি নিয়ন্ত্রণের একপেশে প্রভাব।

দেশজুড়ে ইতিমধ্যে রাজ্যে রাজ্যে রাজ্যপাল পদের অপব্যবহার নিয়ে শুরু হয়েছে বিতর্ক। কোনো সন্দেহ নেই যে নির্বাচিত রাজ্য সরকারের দায়বদ্ধতাকে উপেক্ষা করে রাজ্যপালদের কোনো ছড়ি ঘোরানোর সুযোগ আছে আমাদের সাংবিধানিক কাঠামোতে। কিন্তু ক্রমশ দুর্বল হয়ে আসা এই সাংবিধানিক কাঠামোতে গত কয়েকদশকে নির্বাচিত সরকারকে বিক্ষুব্ধ রাজনৈতিক কারণে অপসারণ করার ক্ষেত্রে রাজ্যপালদের ভূমিকা ছিল মুখ্যত নেতিবাচক। এমনকী সাম্প্রতিক অতীতেও রাজ্যে রাজ্যে সরকার গড়ার ক্ষেত্রে রাজ্যপালদের অনৈতিক অবদানও ভাবিয়ে তুলেছে দেশের মানুষকে। এই পরিপ্রেক্ষিতে রাজনৈতিক কারণে নিযুক্ত রাজ্যপালেরা যদি পদাধিকার বলেই বিশ্ববিদ্যালয়গুলির আচার্য হিসেবে নিয়োজিত হন, সেক্ষেত্রে রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ ভাবনার প্রতিফলন আচার্যের আসনে পড়তে বাধ্য। এই প্রেক্ষিতে আচার্য পদের অবলুপ্তি ঘটিয়ে 'রেক্টর' বা প্রেসিডেন্ট পদ সৃষ্টি করে বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা ভাবনা ভাবা প্রাসঙ্গিক। কারণ এই মুহূর্তে রাজ্য তথা দেশে শিক্ষাক্রম পরিচালিত হচ্ছে মূলত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রীয় ভাবনায় অথচ প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হচ্ছে ব্রিটিশ ধারণার মডেলে। যতদিন না পরিচালন ব্যবস্থার পূর্ণাঙ্গ সংস্কার হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত পদাধিকারবলে রাজ্যপালদের আচার্য পদে না বসানোর আইনি উপায় অন্বেষণ জরুরি। কিন্তু সে সব পরিবর্তনের এক ও একমাত্র পূর্বশর্ত হল স্বশাসনের স্বাধীনতা। আজকের এই আলোচ্য বিধি আপাতভাবে রাজভবনের 'অতিসক্রিয়তা' ঠেকানোর লক্ষে তৈরি হলেও উপলক্ষ হয়ে উঠছে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বশাসন আর স্বাধিকার। বিপদটা রয়ে যাচ্ছে এখানেই।

ভারতের তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পের পঞ্চাশ বছর

দীপাঞ্জন গুহ

২০১৮ সালে ভারতের তথ্যপ্রযুক্তি তথা আইটি শিল্পের বৃহত্তম সংস্থা টিসিএস বা টাটা কনসালটেন্সি সার্ভিসেসের পঞ্চাশ বছর বয়স হল। ঘটনাটি বিভিন্ন কারণে এ-দেশের একটি মাইলফলক হিসেবে গণ্য হওয়ার যোগ্য। প্রায় চল্লিশ লক্ষ প্রত্যক্ষ কর্মী এবং ষোলো হাজার কোটির বেশি মার্কিন ডলার বার্ষিক আয়সমৃদ্ধ তথ্যপ্রযুক্তি শিল্প একই সঙ্গে দেশের জিডিপির একটি উল্লেখযোগ্য অংশ এবং সংগঠিত ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের একটি প্রধান জায়গা।[১]

বস্তুত, তথ্যপ্রযুক্তির কাজে ভারতবর্ষ পৃথিবীর মধ্যে একটি অগ্রণী দেশ। অসংখ্য ভারতীয় ছেলেমেয়ে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে আছে তথ্যপ্রযুক্তির কাজ করতে। প্রত্যেকদিন ভারত থেকে ইউরোপ আমেরিকা অস্ট্রেলিয়া জাপানসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের উদ্দেশে যাত্রা করা এবং এই জায়গাগুলি থেকে ভারতে আসা বিমানগুলিতে তথ্যপ্রযুক্তি কর্মীদের দেখা পাওয়া যাবে, যেমন এদের দেখতে পাওয়া যাবে নিউ ইয়র্ক লন্ডন প্যারিস টোকিওর মতো পৃথিবীর যাবতীয় বড়ো শহরের অফিসপাড়ায়, এমনকী মন্টিভিডিও জোহানেসবার্গ ভিলনিয়াস বা বার্গেনের মতো আরেকটু কম পরিচিত শহরের রাস্তাতেও নিশ্চিতভাবে এদের আপনার চোখে পড়বে। আর দেশের মধ্যে দিল্লি মুম্বাই চেন্নাই কলকাতা হায়দরাবাদ বেঙ্গালুরুসহ সমস্ত বড়ো শহরে গড়ে উঠেছে তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পতালুক, যেমন কলকাতায় সল্টলেক সেক্টর ফাইভ এবং হালে নিউটাউনে। ব্যাঙ্ক অফ অ্যামেরিকা হোক বা বিমা কোম্পানি এআইজি, পৃথিবীর বৃহত্তম পণ্যবাহী জাহাজ কোম্পানি মায়ের্সক, টেলিকম কোম্পানি বামকাস্ট থেকে টার্গেট বা ওয়ালমার্টের মতো সুপার মার্কেট, টয়োটা হন্ডা থেকে যাবতীয় গাড়ি তৈরির কোম্পানি, স্টিল বা অ্যালুমিনিয়ামের পৃথিবীর বৃহত্তম কোম্পানিগুলি, টাইম ওয়ার্নার্স সোনি পিকচার্সসহ সিনেমা প্রস্তুতকারক কোম্পানিগুলি, অর্থাৎ ব্যাবসার সমস্ত ক্ষেত্রের প্রায় সমস্ত বড়ো ও মাঝারি কোম্পানিতে তথ্যপ্রযুক্তির কাজ করতে দেখা যাবে ভারতীয় তথ্যপ্রযুক্তি কর্মীদের, কোনো না কোনো তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থার হাত ধরে, যেমন টিসিএস ইনফোসিস উইপ্রো কগনিজান্ট এইচসিএল ইত্যাদি। কিন্তু এটা কিছুটা পরিতাপের বিষয় যে এই গুরুত্বপূর্ণ, নবীন ও সাধারণের কাছে কিছুটা রহস্যময় ক্ষেত্রটি সম্পর্কে একটু গভীরে গিয়ে চর্চা খুব কমই হয়েছে, বাংলায় তো প্রায় দেখাই যায় না বললে চলে। আর তাই সাধারণভাবে সমাজের চোখে তথ্যপ্রযুক্তির চাকরি হয়ে দাঁড়িয়েছে এমন একটা চাকরি যেখানে লোকে কী করে ঠিক জানি না কিন্তু ভালো মাইনে পায়, মাঝে মাঝে বিদেশে যায়। সরকারের চোখে এটা হয়ে দাঁড়িয়েছে একটা ক্ষেত্র যেটা অনেক লোককে চাকরি দিতে পারে, এবং খুব গুরুত্বপূর্ণ, বিদেশি মুদ্রার সংস্থান বাড়ায় ইত্যাদি। কিন্তু এই মতলবি ধারণার বাইরে, এখানে কী কাজ হয়, তার অন্তর্বস্তু কী, ইতিহাস ভূগোল কী, এ ব্যাপারে আমরা উদাসীন। এখানকার কর্মীরা শ্রমজীবী না বুদ্ধিজীবী এই সিদ্ধান্তও সম্ভবত সমাজ নিয়ে উঠতে পারেনি, যদিও, বেশিরভাগ পেশার মতোই, বুদ্ধি ও শ্রম, দুটি জিনিসই এখানে কাজ করতে গেলে লাগে।

এই অভাববোধ বর্তমান লেখাটির একটি অনুপ্রেরণা যদিও বর্তমান লেখক এই বিষয়ের কোনো গবেষক নন এবং তাই এই বিষয়ে গবেষণাধর্মী আরো বড়ো এবং তথ্যসমৃদ্ধ লেখার কাজটি যোগ্যতর কোনো ব্যক্তিকেই নিতে হবে। আপাতত আমরা বিষয়টির অবতারণামাত্র করতে পারি, নিজেদের অভিজ্ঞতা, ভিতরের ওরাল ট্র্যাডিশন ও সামান্য পড়াশোনার মাধ্যমে। টিসিএসের প্রথম যুগের ইতিহাসের অংশটি মূলত নেওয়া হয়েছে টিসিএসের প্রাক্তন সিইও ও ভারতীয় তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পের প্রতিষ্ঠার অন্যতম উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব এস রামাদুরাই-এর লেখা ‘দ্য টিসিএস স্টোরি অ্যান্ড বিয়ন্ড’ বইটি থেকে (পেংগুইন, প্রথম প্রকাশ ২০১১)।

শুরুতেই বলেছি ২০১৮ সালে পঞ্চাশ বছরে পড়ল টিসিএস। এবং টিসিএসের পঞ্চাশ বছরকে মোটামুটি প্রশ্নাতীতভাবে ভারতের তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রের পঞ্চাশ বছর হিসেবে ধরা যায়। কারণ টিসিএসের হাত ধরেই তথ্যপ্রযুক্তি

একটি স্বাধীন শিল্প হিসেবে এদেশে আত্মপ্রকাশ করে ১৯৬৮ সালে। তাই বর্তমান লেখাটির আরেকটি অনুপ্রেরণা ভারতীয় তথ্যপ্রযুক্তির পঞ্চাশ বছর পূর্ণ করার উদযাপন।

সহজ ভাষায় তথ্যপ্রযুক্তি

আলোচনার একদম শুরুতে আমাদের প্রয়োজন সহজ ভাষায় তথ্যপ্রযুক্তি ব্যাপারটা কী সেটা একটু বুঝে নেওয়ার।

একথা বলা বাহুল্য যে তথ্যপ্রযুক্তি এখন একটি বিশাল ক্ষেত্র, তাকে বোঝানোর জন্য বহু জটিল ও লম্বা লেখা লেখা যায়। কিন্তু এই লেখার স্বার্থে আমাদের উদ্দেশ্য যে-পাঠক বিষয়টি সম্পর্কে কিছুমাত্র ওয়াকিবহাল নন, তাঁর জন্য যথাসম্ভব সরলভাবে ও অল্প কথায় বিষয়টি সম্পর্কে একটি ন্যূনতম ধারণা তৈরি করা, যাতে তিনি পরবর্তী মূল অংশটির রসগ্রহণ করতে পারেন। যাঁর ইতিমধ্যেই বিষয়টি সম্পর্কে জানা আছে, তিনি এই অংশটি বাদ দিয়ে সরাসরি লেখার পরবর্তী অংশে চলে যেতে পারেন।

শুরুতে একটা কথা বলা দরকার— গত এক দশকে স্মার্টফোন, দ্রুতগতির ইন্টারনেটসহ আরো দু-একটি প্রযুক্তির আগমনে তথ্যপ্রযুক্তির মূল অন্তর্বস্তুটির অনেকটা প্রতিবর্তন ঘটে গেছে। ব্যাপারটা একটা সরল উদাহরণ দিলে বুঝতে সুবিধা হবে। একসময় ট্রেনের টিকিট কাটতে হত স্টেশনে গিয়ে টিকিট কাউন্টার থেকে, কোন ট্রেনের কবেকার কত টিকিট বিক্রি হল, কোন বার্থ সংরক্ষিত হয়ে গেল, এ-সবই হিসেব রাখতে হত কাগজপত্রে। তথ্যপ্রযুক্তির প্রথম প্রজন্মে এই কাজটির সিংহভাগ কম্পিউটারের হাতে তুলে দেওয়া হল। তখন বিভিন্ন রেলওয়ে রিজার্ভেশন কাউন্টারে গিয়ে একটা ফর্ম ভরে লাইনে দাঁড়িয়ে কাউন্টারের ওপারে বসা রেলের কর্মচারীর হাতে ফর্মটা তুলে দিতে হত, তারপর তিনি ওটা দেখে কি-বোর্ডের সাহায্যে কম্পিউটার স্ক্রিনে ওরকম আরেকটি ফর্ম ভরতেন। তারপর কম্পিউটারের একটা বিশেষ বোতাম টিপলে ওই তথ্যগুলির ভিত্তিতে ওই ট্রেনে ওই দিনে আপনার বার্থটি সুরক্ষিত হত। আপনার নাম, ট্রেনের নাম, সুরক্ষিত বার্থ নম্বর, যাত্রার দিনসহ গুরুত্বপূর্ণ তথ্যগুলি কম্পিউটারের মধ্যে কোথাও একটা গিয়ে জমা হত ও থাকত। আপনার রিজার্ভ করা বার্থটির নামে কম্পিউটার তথ্য রাখার জায়গায় (কোনো কাগজপত্র নয়, একটি কোনো বৈদ্যুতিন বা চৌম্বকীয় মাধ্যম, যেটা কম্পিউটারের মধ্যে থাকে) একটি ঢ্যাঁড়া পরে যেত যাতে সেই বার্থটি আর কাউকে দেওয়া না যায়। আপনি প্রিন্টার থেকে বেরোনো একটি টিকিট প্রমাণ হিসেবে হাতে পেতেন। পুরো কাজটির গতি অনেক বাড়ত, মানুষের শ্রমশক্তি কমত, একই বার্থ ভুল করে দুজনকে দিয়ে দেওয়ার সম্ভাবনা থেকে যেত, আপনার চিন্তা কমত, ইত্যাদি। পরবর্তীকালে ইন্টারনেটের সুবিধা নিয়ে এই ব্যবস্থার পাশাপাশি এই কাজ একটি ওয়েবসাইট ব্যবহার করে বাড়িতে বসে আপনি নিজেই করতে পারেন।

আর তথ্যপ্রযুক্তির বর্তমান প্রজন্মে এই কাজটি একটি ‘অ্যাপ’-এর সাহায্যে আপনি বাসে যেতে যেতে নিজের স্মার্টফোন থেকেও করতে পারেন। সুতরাং কাজটি কম্পিউটার-এর সাহায্যে টিকিট কাটা ও সমস্ত তথ্য বিনা কাগজে বৈদ্যুতিন বা চৌম্বকীয় মাধ্যমে জমা রাখা আগেই হয়েছিল, তথ্যপ্রযুক্তির প্রথম জমানায়। আর এখনকার তথ্যপ্রযুক্তির কেন্দ্রবিন্দুতে আছে এই প্রযুক্তির হাত আরো লম্বা করে সেটাকে আরো সহজে উপভোক্তার কাছে পৌঁছে দেওয়ার কাজটি। ব্যাঙ্কের শাখার কাজ কম্পিউটারের সাহায্যে হওয়া শুরু হয়েছিল প্রথম প্রজন্মে, আর এখন স্মার্টফোনের সাহায্যে আপনার অ্যাকাউন্ট থেকে আপনি অন্য কাউকে টাকা পাঠাতে পারেন, এটা আরেকটা উদাহরণ। আরো অসংখ্য উদাহরণ দেওয়া যায়, বলাই বাহুল্য।

তথ্যপ্রযুক্তির কেন্দ্রে আছে একটি কম্পিউটার। কম্পিউটার ব্যাপারটা এককথায় বলা হলেও তার আবার কিছু আলাদা অংশ আছে। প্রথম ভাগে আছে কি-বোর্ড, মাউস, স্ক্রিন বা মনিটর, প্রিন্টার ইত্যাদি, যাদের সাহায্যে কম্পিউটারের সঙ্গে মানুষের যোগাযোগ হয়, কি-বোর্ডের সাহায্যে একজন মানুষ কম্পিউটারকে কিছু তথ্য দেন, স্ক্রিনে কম্পিউটার থেকে আসা তথ্য, রাশি, বার্তা ইত্যাদি দেখা যায়, প্রিন্টারের সাহায্যে কম্পিউটারের মধ্যে থেকে কিছু কাগজে ছাপানো যায়, ইত্যাদি।

দ্বিতীয় ভাগে আছে কম্পিউটারের ভেতরের গুদামঘর বা স্টোরেজ। এই স্টোরেজেই থাকে কম্পিউটারে বাইরে থেকে ঢোকানো তথ্য এবং কম্পিউটারের নিজের তৈরি করা তথ্যাদি। আমাদের রেলের টিকিটের উদাহরণে কিছু তথ্য আমরা বাইরে থেকে দিয়েছিলাম, যেমন গ্রাহকের নাম, ট্রেনের নাম, যাত্রার দিন, ইত্যাদি। আর ট্রেনের কোন কম্পার্টমেন্টের কোন বার্থটি গ্রাহকের জন্য নির্দিষ্ট হল, সেটা কম্পিউটারের ভিতরে চলা একটি প্রোগ্রামের মাধ্যমে ঠিক হয়েছে। রিজার্ভেশন হওয়ার পর এই দুরকম তথ্যই বাইরে থেকে দেওয়া নাম, দিন, ইত্যাদি ও কম্পিউটারের ভেতরে নির্ধারিত হওয়া কম্পার্টমেন্ট ও বার্থ নম্বর কম্পিউটারের স্টোরেজে ধরে রাখতে হবে।

আর তৃতীয় ভাগে আছে কম্পিউটারের মস্তিষ্ক বা সিপিইউ। এই অংশটির সাহায্যেই কম্পিউটার হিসেব নিকেশ করা, বার্তা বোঝা, তথ্য প্রক্রিয়াকরণের কাজটি করে। এই মস্তিষ্ক কাজ করে ইলেকট্রনিক্সের বিজ্ঞানে, মূলত তড়িতের উচ্চাবচকে ব্যবহার করে, আপাতত এইটুকু জেনে রাখলেই চলবে। আর কখন কী কাজ করতে হবে অর্থাৎ আপনার জন্য একটি ট্রেনের টিকিট কাটতে হবে নাকি আপনার নির্দেশে আপনার অ্যাকাউন্ট থেকে

আরেকজনের অ্যাকাউন্টে টাকা পাঠাতে হবে— এটা মস্তিষ্ককে অর্থাৎ সিপিইউ-কে বলে দেয় মানুষের লেখা একটি নির্দেশাবলি বা কম্পিউটারের ভাষায়, একটি প্রোগ্রাম। প্রোগ্রামের মধ্যে থাকে ধাপে ধাপে যে কাজগুলি করতে হবে তার নির্দেশ। নির্দেশগুলি লেখা থাকে সাংকেতিক ভাষায় বা কম্পিউটার ল্যাঙ্গুয়েজ-এর সাহায্যে, যেমন সি, জাভা ইত্যাদি। কম্পিউটারের সিপিইউ এইরকম কিছু বিশেষ ভাষায় লেখা সংকেত বুঝতে পারে, তাই প্রোগ্রামগুলি এইসব ভাষাতেই লিখতে হবে, ইংরেজি বাংলায় লিখলে হবে না।

অর্থাৎ ব্যাপারটি দাঁড়াল এরকম যে তথ্য রাশি গণনা ইত্যাদি সংক্রান্ত কোনো কাজ, যেগুলি একই নিয়মে বারবার হয়, তাকে পরপর সাজানো কয়েকটি সাংকেতিক নির্দেশ বা কম্পিউটার প্রোগ্রামের দ্বারা করানো যায়। এবং কম্পিউটার যেহেতু প্রকৃত অর্থেই প্রায় তড়িৎ গতিতে কাজ করে তাই জটিল ও লম্বা গণনা ও কাজ করতে কম্পিউটার সময় নেয় মানুষের তুলনায় অতি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ।[২] সেই কারণেই গত পঞ্চাশ বছরে একের পর এক বিভিন্ন কাজ ক্রমাগত কম্পিউটারের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। যত তুলে দেওয়া হয়েছে তত বেশি করে মানুষকে কম্পিউটার প্রোগ্রাম লিখতে হয়েছে। এই প্রোগ্রাম লেখার কাজই তথ্যপ্রযুক্তির মূল একটি কাজ। এ ছাড়া আছে প্রোগ্রামগুলির রক্ষণাবেক্ষণ। একটি প্রোগ্রাম আজ যেভাবে একটি কাজ করার জন্য লেখা হয়, কাল সেই কাজটি একটু অন্যরকমভাবে করার প্রয়োজন হতে পারে। যদি এই পরিবর্তনটি খুব বড়ো না হয়, তা হলে অনেকক্ষেত্রেই একটি নতুন প্রোগ্রাম না লিখে পুরোনো প্রোগ্রামটিকেই একটু অদলবদল করে নেওয়া হয়। এই রক্ষণাবেক্ষণও তথ্যপ্রযুক্তির আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

এ ছাড়া গত দুই দশকে আরো দুটি বড়ো ধরনের কাজ যুক্ত হয়েছে তথ্যপ্রযুক্তিতে। প্রথমটি তথ্যপ্রযুক্তির পরিকাঠামো পরিষেবার (ইনফ্রাস্ট্রাকচার সার্ভিসেস) কাজ। এক্ষেত্রে পরিকাঠামো বলতে সার্ভার (যে কেন্দ্রীয় কম্পিউটারে প্রোগ্রামগুলি চলে), নেটওয়ার্কের বিভিন্ন অংশ যথা সুইচ, রাউটার, ফায়ারওয়াল, ইত্যাদি। ভারতীয় তথ্যপ্রযুক্তি কোম্পানিগুলি এই যন্ত্র বা যন্ত্রাংশগুলি তৈরি করে না, কিন্তু যন্ত্রগুলিকে এক-একজন গ্রাহকের প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবহার-উপযোগী করে তোলে। দ্বিতীয়টি ব্যাবসার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য প্রস্তুতির কাজ। এটাকেই চলতি কথায় বিপিও (বিসনেস প্রসেস আউটসোর্সিং)-র কাজ বলে। এক্ষেত্রে মূলত হাতে থাকা তথ্যকে পূর্বনির্ধারিতভাবে বিশ্লেষণ করে ব্যাবসার জন্য প্রয়োজনীয় রিপোর্ট তৈরি করা হয়। এ ছাড়াও আছে কম্পিউটার-কে পূর্বনির্ধারিত ছকে তথ্য সরবরাহ করা বা ওই ধরনের তুলনামূলকভাবে ছকে-বাঁধা কিছু কাজ।

এ ছাড়াও এই কাজগুলির আনুষঙ্গিক আরো অনেক কাজ আছে।

সেই সময় ও শুরুর কথা

ভারতীয় তথ্যপ্রযুক্তির ইতিহাসের আলোনার শুরুতেই সেই সময়টাকে একটু বুঝে নেওয়া দরকার। ষাটের দশক মানে স্বাধীনতার পরে সবে দ্বিতীয় দশক। হাতে একগুচ্ছ সমস্যা— খাদ্যের অভাব, বাণিজ্যে ঘাটতি। সবে দুটো যুদ্ধ হয়েছে ১৯৬২ সালে চিন ও ১৯৬৫ সালে পাকিস্তানের সঙ্গে। পরিকল্পিত অর্থনীতির লক্ষ্যে ব্যাবসা বাণিজ্যের ওপর ব্যাপক রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ, লাইসেন্স রাজ ও সরকারি লাল-ফিতের চক্কর। এই সময়েই শুরু হয়েছে নকশাল আন্দোলনের উত্থান।

প্রযুক্তিতেও ভারত তখনও পিছিয়ে থাকা একটি দেশ। ইলেকট্রনিক্স প্রযুক্তি বলতে রেডিয়ো ও টেলিফোনের বেশি খুব একটা কিছু নেই। যদিও ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিকাল ইনস্টিটিউট ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌথ উদ্যোগে ষাটের দশকেই শুরু হয়েছিল ভারতের নিজস্ব কম্পিউটার ISIJU তৈরির কাজ, তার পরিধি ছিল মূলত পড়াশোনা ও গবেষণা। দৈনন্দিন জীবনে কম্পিউটারের ব্যবহার তো ছিলই না, যন্ত্রটির সঙ্গে সাধারণের কোনো পরিচয়ও ছিল না, যেটুকু ছিল সেটা ভয় যা আরো প্রায় দুদশক বিরাজ করে ও বাড়তে থাকে। তারপর থেকে প্রযুক্তির নিজস্ব অপ্রতিহত ঢেউয়ে চড়ে কম্পিউটার ক্রমশ সর্বত্র ছড়িয়ে পড়তে থাকে।

এইরকম সময়ে ষাটের দশকের প্রথমার্ধে টাটা গোষ্ঠীর চেয়ারম্যান জে আর ডি টাটার কাছে একটি প্রস্তাব আসে টাটা গোষ্ঠীর কোম্পানিগুলির তথ্য প্রক্রিয়াকরণের (data processing) যা কাজ হয়, সেগুলি করার জন্য গোষ্ঠীর মধ্যে একটি আলাদা দল তৈরি করা হোক, যাদের বিশেষ যোগ্যতা থাকবে এই কাজে। ততদিনে টাটা গোষ্ঠীর বয়স প্রায় একশো বছর (সূচনা ১৮৬৮), বহু ঝুঁকিপূর্ণ এবং ভবিষ্যৎদর্শী সিদ্ধান্ত নিয়েই বড়ো হয়েছে তাদের ব্যাবসা, সেই ঐতিহ্য পিছনে নিয়ে জে আর ডি এই প্রস্তাবে সাড়া দিলেন। টাটা গ্রুপের একটি নিজস্ব দল তৈরি হল শুধুমাত্র তথ্যপ্রযুক্তির কাজ করার জন্য। তখনও পর্যন্ত তাদের উদ্দেশ্য শুধু টাটা গোষ্ঠীর বিভিন্ন কোম্পানির— টেলকো, টিসকো, ইত্যাদি— বিবিধ তথ্য প্রক্রিয়াকরণের কাজগুলো করা। টাটা গোষ্ঠীর তরফে বিনিয়োগ করা হল পঞ্চাশ লক্ষ টাকা। ঠিক হল দলটি টাটা সন্সের একটি ডিভিশন হিসেবে কাজ করবে। তখনও পর্যন্ত নামহীন দলটি বম্বের টাটা হেডকোয়ার্টার থেকে সরে গেল সেই শহরেরই আর্মি নেভি বিল্ডিং-এ।

পথচলা তো শুরু হল, কিন্তু শুরুর যাত্রা মোটেও সহজ ছিল

না। তার আগে তথ্যপ্রযুক্তি শিল্প বলে কিছু ছিল না, আর তাই আমার সংস্থার তথ্য প্রক্রিয়াকরণের কাজ আমি অন্য কারুর হাতে তুলে দেব, সে আমার সংস্থার লোক নয় কিন্তু আমার হয়ে এই কাজগুলি করে দেবে, এগুলো ভাবা অত সহজ ছিল না। সঙ্গে ছিল কিছু স্বাভাবিক নিরাপত্তাহীনতা— আমার কাজ অন্য কেউ করে দিলে আমার চাকরি থাকবে কি না। সব মিলিয়ে, প্রথম দিকে টাটা গ্রুপের কোম্পানিগুলি এই সদ্য তৈরি হওয়া দলটির হাতে কাজ দিতে খুব একটা চাইছিল না, টাটা ইলেকট্রিক ছাড়া। নবজাতক, তখনও পর্যন্ত নামহীন দলটিকে তাই ভাবনাচিন্তা শুরু করতে হল তার অস্তিত্বের মূল কারণটিকে (অর্থাৎ, টাটা কোম্পানিগুলির তথ্য প্রক্রিয়াকরণ) অতিক্রম করে টাটা গ্রুপের বাইরে কাজ খোঁজার। এখন পিছন ফিরে দেখলে মনে হয় এই সবকটা ঘটনাই ভারতীয় তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পের গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

কিন্তু অচিরেই তারা উপলব্ধি করল যে বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে কম্পিউটারে করা কাজের জন্য তদবির করতে গেলে নিজেদের একটা কম্পিউটার লাগবে। সে-যুগে কম্পিউটার বলতে আজকের হালকা ল্যাপটপ নয়, ঘরজোড়া একটা যন্ত্র। কম্পিউটার কেনা ব্যাপারটা একটা কোম্পানির কাছেও একটা বড়ো অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত। তা হলে কোন কম্পিউটার কেনা যায়? একটি ব্রিটিশ কোম্পানি শুধু এই পরামর্শটুকু দেওয়ার জন্য দশ হাজার পাউন্ড চেয়েছিল (আজকের হিসেবে প্রায় দেড় লক্ষ পাউন্ড, অর্থাৎ দেড় কোটি টাকা)! সে প্রস্তাব বলাই বাহুল্য বাতিল হয়ে যায়। এমনিতেই ১৯৬৪ সালে খুব বেশি কম্পিউটার বাজারে ছিল না। দলটি সিদ্ধান্ত নেয় আইবিএমের কম্পিউটার ব্যবহার করার। কিন্তু টাকা বাঁচাতে প্রথমেই কম্পিউটার না কিনে ঠিক করে কম্পিউটারের সময় কেনার অর্থাৎ যতটা সময় একটি কম্পিউটার ব্যবহার করা হবে, সেই অনুযায়ী পয়সা দেওয়া হবে; বাকি সময় অন্য কেউ ব্যবহার করতে পারে। মেইনফ্রেম কম্পিউটার খুব দামি হওয়ায় এই ব্যবস্থাটি চালু আছে।

এইভাবে কয়েক বছর চলার পর ১৯৬৮ সালে টাটা গোষ্ঠী সিদ্ধান্ত নেয় আরো কয়েকটি ডিভিশনের সঙ্গে তখনও পর্যন্ত নামহীন এই দলটিকে একটি স্বতন্ত্র অপারেটিং ইউনিট বানানো হবে, অর্থাৎ টাটা সন্স-এর মধ্যে থাকলেও নিজেরা অনেকটা সিদ্ধান্ত নেবে, লাভ-ক্ষতির হিসেব রাখবে। নতুন কোম্পানির নামকরণ হল টাটা কনসালটেন্সি সার্ভিসেস বা টিসিএস। টাটা ইলেকট্রিকের তৎকালীন এমডি পি এম আগরওয়াল টিসিএসের ডিরেক্টর নিযুক্ত হলেন। এই সময় টিসিএসের কাছে দুটি কম্পিউটার ছিল। একটি আইবিএম-এর একটি মেইনফ্রেম কম্পিউটার, ভাড়ায় নেওয়া, অপরটি আইসিএল কোম্পানির একটি কম্পিউটার। এই কম্পিউটারটি কলকাতায় লাইফ ইনশিয়োরেন্স কর্পোরেশনের অফিসে পড়ে ছিল। ব্যবহার করার ইচ্ছে নিয়েই এলআইসি কম্পিউটারটি কিনেছিল, কিন্তু কাজ হারানোর ভয়ে আতঙ্কিত কর্মচারীদের আন্দোলনের জেরে যন্ত্রটিকে খোলা যায়নি। শেষপর্যন্ত এলআইসি যন্ত্রটিকে বিদায় করার সিদ্ধান্ত নেয় আর মওকা বুঝে টিসিএস সেটিকে মূল দামের ভগ্নাংশে কিনে নেয়। এই কম্পিউটার দুটিকে বম্বের নির্মল বিল্ডিং-এর আটতলায় বসানো হয়, জায়গাটির নাম দেওয়া হয় টাটা কম্পিউটার সেন্টার এবং সেটিই দাঁড়ায় টিসিএসের প্রথম ঠিকানা। দুবছর পর পার্শ্ববর্তী এয়ার ইন্ডিয়া বিল্ডিং-এ আরো দুটি তলা ভাড়া নেওয়া হয়।

তখনও ভারতে কম্পিউটার সায়েন্সে কোনো স্নাতক বা স্নাতকোত্তর কোর্স শুরু হয়নি। কানপুর আইআইটিতে কম্পিউটার সায়েন্সে স্নাতকোত্তর ও পিএইচডি শুরু হয় ১৯৭১ থেকে। এরও প্রায় এক দশক পরে শুরু হয় স্নাতক স্তরের কোর্স।[৩] সুতরাং তখন ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যারা ইলেকট্রিক্যাল বা ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং ইত্যাদি নিয়ে স্নাতক হত, তাদের মধ্যে যাদের কম্পিউটার সায়েন্স নিয়ে স্নাতকোত্তর পড়াশোনা করার ইচ্ছা থাকত এবং সঙ্গে থাকত সাধ্য বা সুযোগ, তারা বিদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে যেত এ-বিষয়ে পড়াশোনা করতে। ভারতের তথ্যপ্রযুক্তির একদম শুরুর দিকের কর্মীদের অনেকেই ছিল এই ধারায় শিক্ষিত। এ ছাড়াও ছিল গণিত ও রাশিবিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করা লোকজন, যাদের মধ্যে এই কাজের যোগ্য সৃজনশীলতা চোখে পড়ত। এরকম সৃজনশীল, কিছুটা অ্যাডভেঞ্চারাস একটা দলকে নিয়ে চলার জন্য সম্ভবত প্রয়োজন হয়েছিল একজন দূরদর্শী নেতা যিনি দলটিকে একাধারে নিয়মানুবর্তীতায় বাঁধতে পারবেন এবং দিশা দেখাতে পারবেন। সেই কাজ করার জন্য ১৯৬৯ সালে টাটা ইলেকট্রিক থেকে এফ সি কোহলিকে নিয়ে আসা হয় টিসিএসের জেনারেল ম্যানেজার হিসেবে (পদটি ওঁর জন্য তখনই তৈরি করা হয়)। পরবর্তীকালে এই শিল্পের যে বিরাট বিস্তার ঘটে, তার জন্য পদ্মভূষণসহ বহু সম্মানে ভূষিত কোহলিকে অনেক সময় ভারতীয় তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পের জনক বলা হয়।

টিসিএসের প্রথম দিকের গ্রাহকদের মধ্যে ছিল টাটাদের সংস্থা টিসকো, টেলকো, টাটা ইনস্টিটিউট অফ সোশ্যাল সায়েন্সেস। এ ছাড়া ছিল কয়েকটি সরকারি সংস্থা যেমন হ্যাল (হিন্দুস্তান অ্যারোনোটিক্স লিমিটেড), ডিডিএ (দিল্লি ডেভেলপমেন্ট অথরিটি), ভারত সরকারের পরমাণু শক্তি দপ্তর, ইত্যাদি। এদের বিভিন্ন তথ্য প্রক্রিয়াকরণের দরকার ছিল যেগুলোয় টিসিএস এদের সাহায্য করত। এ ছাড়াও কেউ কেউ আসত পরিচালনাগত পরামর্শ বা ম্যানেজমেন্ট কনসালটেন্সির জন্য (তথ্যপ্রযুক্তি ছাড়া টিসিএস সেই সময় এই ধরনের

পরামর্শও দিত)। এরকমই ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির সেই সময় টিসিএসকে নিযুক্ত করেছিল তাদের দেওয়া সরকারি সাহায্য মানুষের কাছে পৌঁছচ্ছে না কেন এ ব্যাপারে তাদের পরামর্শ দেওয়ার জন্য।

সত্তরের দশক, লাইসেন্স রাজ ও নতুন দিগন্ত

১৯৭৩ সালে ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বাধীন ভারত সরকার আর্থিক ঘাটতির মোকাবিলা করার উদ্দেশ্যে একটি নতুন আইন প্রণয়ন করল। ফেরা (ফরেন এক্সচেঞ্জ রেগুলেশন অ্যাক্ট) নামের এই নতুন আইনটি আমদানি রপ্তানি, বিদেশের সঙ্গে করা কোনো অর্থনৈতিক লেনদেন বা সেই অর্থে যে-কোনো লেনদেন যার প্রভাব দেশের বিদেশি মুদ্রার সঞ্চয়ের ওপর পড়তে পারে, তার ওপর অনেক কঠোর বিধিনিষেধ নিয়ে এল। এর প্রভাব সরাসরি পড়ল নবীন তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পের ওপর।

আমদানি শুল্ক হয়ে উঠল অনেকটা বেশি। হার্ডওয়ার (কম্পিউটার, প্রিন্টার ইত্যাদি) আমদানির ওপর শুল্ক গিয়ে দাঁড়াল ১৩৫% এবং সফটওয়্যার (বিভিন্ন রকম কম্পিউটার প্রোগ্রাম) আমদানির ওপর ১০০%। এ ছাড়া তখনও তথ্যপ্রযুক্তি স্বতন্ত্র শিল্পের মর্যাদা পায়নি, এবং তাই ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ পাওয়া সম্ভব ছিল না। ফেরা-র নিয়ম অনুযায়ী কোনো বিদেশি কোম্পানিকে ভারতে ব্যাবসা করতে গেলে তা করতে হত একটি ভারতীয় কোম্পানির সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে (জয়েন্ট ভেঞ্চার), যেখানে বিদেশি কোম্পানিটির সর্বোচ্চ অংশীদারিত্ব থাকতে পারে ৪০%।

এই শর্তকে গ্রহণযোগ্য না মনে করে অনেক বিদেশি কোম্পানি ভারত থেকে তাদের ব্যাবসা গুটিয়ে নেয়, যাদের মধ্যে ছিল আইবিএম, যারা তখনকার মতো তাদের ভারতের ব্যবসায় ঝাঁপ ফেলে ১৯৭৮ সালে। অন্যদিকে আরো কিছু বিদেশি কোম্পানি এই শর্ত মেনে একটি ভারতীয় পার্টনারের খোঁজ শুরু করে যৌথ উদ্যোগের স্বার্থে। এরকমই একটি কোম্পানি ছিল বারোস কর্পোরেশন (Burroughs Corporation), সেই সময়ের কম্পিউটার প্রস্তুতকারক সংস্থাগুলির মধ্যে অন্যতম।

১৯৭৩ সালে বারোস টাটা সন্সের কাছে ভারতে ব্যাবসা করার উদ্দেশ্যে একটি যৌথ উদ্যোগ তৈরি করার প্রস্তাব রাখে। বারোসের প্রস্তাব নিয়ে ভাবনাচিন্তা শুরু হয়, কিন্তু টাটা সন্সের সঙ্গে জয়েন্ট ভেঞ্চার তৈরি হওয়ার আগেই ১৯৭৪ সালে টিসিএসের সঙ্গে বারোসের একটি ব্যবসায়িক বোঝাপড়া হয়। এই চুক্তি অনুযায়ী বারোসের কম্পিউটারগুলি ভারতে বিক্রি করার এবং গ্রাহক পরিষেবা দেওয়ার দায়িত্ব নেয় টিসিএস। দুটি কোম্পানির জন্যই এই চুক্তিটি কিছু গুরুত্বপূর্ণ সুবিধা নিয়ে আসে। বারোসের সামনে খোলে ফেরা-র বিধিনিষেধের মধ্যে ভারতে ব্যাবসা বাড়ানোর সুযোগ আর টিসিএসের সামনে আসে আধুনিক প্রযুক্তির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হওয়ার ও হাতেনাতে কাজ করার সুযোগ।

১৯৭৪ সালে টিসিএস তিন লক্ষ মার্কিন ডলার ও সমপরিমাণ আমদানি শুল্ক দিয়ে একটি বারোসের মেইনফ্রেম কম্পিউটার নিজেদের জন্য নিয়ে আসে। টাটার মতো বড়ো একটি শিল্পগোষ্ঠীর একটি কোম্পানির জন্যও সেই সময়ের বিচারে এটি ছিল একটি বিশাল অঙ্ক। এই পরিমাণ বিদেশি মুদ্রা খরচ করার জন্য টিসিএস-কে সরকারকে প্রতিশ্রুতি দিতে হয় পরের পাঁচ বছরের মধ্যে এর দ্বিগুণ পরিমাণ বিদেশি মুদ্রা ভারতে আয় করে আনার। টিসিএসের আশা ছিল এই নতুন কম্পিউটারের সাহায্যে বারোসের জন্য প্রোগ্রাম লিখে এবং পুরোনো প্রোগ্রামগুলিকে পালটে এই নতুন কম্পিউটারের উপযুক্ত করে এই টাকা তারা আয় করবে।

পরিকল্পনাটি কাজ করল এবং একই সঙ্গে ভারতীয় তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পের জন্য নিয়ে এল প্রথম বিদেশে গিয়ে কাজ করার সুযোগ, কারণ বারোস টিসিএস-কে বলল এই একই কাজ বিদেশে গিয়ে তাদের কোনো কোনো অন্য গ্রাহকের জন্যও করতে। এটিই ছিল তথ্যপ্রযুক্তির প্রথম 'আউটসোর্সিং' চুক্তি এবং ভারতীয় তথ্যপ্রযুক্তির আউটসোর্সিং-এর ধারণা তথা ব্যবস্থার সূচনা। এই মডেলটিই এই শিল্পের মূল কাঠামো, যা পরের চল্লিশ বছর ধরে উত্থানপতনের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে, অনেক বড়ো হয়ে, সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে এই শিল্পক্ষেত্রটিকে আজকের জায়গায় নিয়ে এসেছে। বস্তুত ১৯৭৪ থেকে ১৯৭৬-এর মধ্যের ঘটনাবলি এই শিল্পের প্রধান গতিপথ নির্ধারণ করে দেয় এবং শক্ত ভিতের ওপর দাঁড় করায়।

এই প্রসঙ্গে 'আউটসোর্সিং' সম্পর্কে অল্প কিছু কথা বলা দরকার। 'আউটসোর্সিং'-এর অর্থ একটি সংস্থার কাজের কোনো একটি অংশ বাইরের বিশেষজ্ঞদের দিয়ে করানো (ব্যক্তি বা সংস্থা)। একটি উদাহরণ দেওয়া যায়— প্রতি মাসের শেষে কর্মীদের বেতন দেওয়া ও সেই সংক্রান্ত হিসেবনিকেশ করার কাজটি সব কোম্পানিকেই করতে হয়, তা সে গাড়ি তৈরির কোম্পানি হোক বা ওষুধ তৈরির। বহুদিন ধরে প্রায় সমস্ত মাঝারি ও বড়ো কোম্পানি কাজটি করে কম্পিউটারের সাহায্যে। কোম্পানিগুলি প্রথমদিকে এই কাজটি তাদের নিজস্ব কর্মীদের দিয়েই করত। কিন্তু ক্রমশ তারা ভাবল যে তাদের কোম্পানির প্রধান কাজ গাড়ি তৈরি বা ওষুধ তৈরি, সেই বিষয়ের প্রযুক্তি নিয়ে চর্চা, কম্পিউটারের সাহায্যে বেতনের হিসাব রাখা নয়, তাই এই কাজের সিংহভাগ আমরা তুলে দেব তাদের হাতে যারা কম্পিউটারে প্রোগ্রাম লেখার বিশেষজ্ঞ, সেই

প্রযুক্তি সম্পর্কে যাদের জ্ঞান। এ ছাড়াও ইয়োরোপ আমেরিকায় একজন কর্মীর পিছনে খরচ ভারতের থেকে অনেক বেশি, তাই যদি এই কাজটি ভারতে এসে করা যায়, তা হলে খরচও কমে; এটি 'আউটসোর্সিং'-এর আরেকটি অন্যতম কারণ। তবে এখানে বলে রাখা দরকার যে ওপরে বর্ণিত দুটি কারণই সমান গুরুত্বপূর্ণ, যদিও বাইরে থেকে অনেকেই ভাবেন যে দ্বিতীয় অর্থাৎ খরচ কমানোর কারণটিই আউটসোর্সিং-এর একমাত্র কারণ। যত দিন গেছে তত প্রথম কারণটির গুরুত্ব বেড়েছে কারণ যে-কোনো বিষয়েই প্রযুক্তি ক্রমশ বহুমুখী ও জটিলতর হয়েছে, যে ক্ষেত্রে আজ যদি একটি গাড়ি তৈরির বা ওষুধ তৈরির কোম্পানিকে তাদের সমস্ত তথ্যপ্রযুক্তির কাজ কর্মীদের দিয়ে করতে হয়, তা হলে একটি বিরাট তথ্যপ্রযুক্তি দপ্তর রাখতে হবে এবং সে ব্যাপারে প্রচুর সময় ও মনোযোগ ব্যয় করতে হবে। 'আউটসোর্সিং' অনেক বিষয়েই হতে পারে, তবে এই লেখার স্বার্থে আমরা তথ্যপ্রযুক্তির আউটসোর্সিং-ই বোঝাচ্ছি।

সত্তরের দশকের মাঝামাঝি এই দেশে বসে আরেকটি দেশের কোনো কোম্পানির জন্য তথ্য প্রযুক্তির কাজ করার মাহাত্ম্যটা যাঁরা কম্পিউটার এবং প্রোগ্রামিং নিয়ে কিছুটা ওয়াকিবহাল তাঁরা সহজেই বুঝতে পারবেন। তখন ইন্টারনেট ছিল না। আজ প্রতি মুহূর্তে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে অভাবনীয় পরিমাণ তথ্য বা ডেটা পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে পাড়ি দিচ্ছে। কেউ যখন ফেসবুক বা ইমেল দেখছে, অ্যামাজোন বা ফ্লিপকার্টে কিছু কিনছে বা কম্পিউটারে ট্রেনের টিকিট কাটছে, সেগুলো সবই সম্ভব হচ্ছে তথ্যের এই মুহূর্তে দুনিয়া পাড়ি দেওয়ার ক্ষমতার জন্য। একই উপায়ে ভারতে বসে লেখা প্রোগ্রাম মুহূর্তে পৌঁছে দেওয়া যাচ্ছে আমেরিকা ইয়োরোপের কোনো কোম্পানির কম্পিউটারে। কিন্তু ইন্টারনেটের আগে এই কাজ ছিল দুরূহ। প্রোগ্রাম লিখতে হত পাঞ্চড কার্ড নামক এক ধরনের কার্ডে। তারপর খামে ভরে সেই কার্ড সাধারণ ডাক ব্যবস্থায় পাঠাতে হত গ্রাহক তথা ক্লায়েন্টের কাছে। পথে যদি হারিয়ে যায়, সেই বিপদ থেকে বাঁচতে পরের দিকে ডাকে পাঠানো হত একই প্রোগ্রাম লেখা পাঞ্চড কার্ডের আরেকটি গুচ্ছ। এইভাবে শুরু হয়েছিল ভারতীয় তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পের প্রথম অধ্যায় এবং সেই পদ্ধতিতে ব্যাবসা চালিয়েই অর্জন করতে হয়েছে সারা পৃথিবীর আস্থা, যার ওপর ভিত্তি করে আজ এই শিল্পে ভারত হয়ে উঠেছে একটি অগ্রণী দেশ, শহরে শহরে গজিয়ে উঠেছে ঝাঁ-চকচকে তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পতালুক।

বারোসের সঙ্গে টিসিএসের এই চুক্তিটি বহাল ছিল চার বছর। এরপর ১৯৭৮ সালে সেই পাঁচ বছর আগের প্রস্তাবের ভিত্তিতে টাটা সন্স ও বারোসের মধ্যে জয়েন্ট ভেঞ্চারটির সিদ্ধান্ত পাকা হয়। নতুন কোম্পানির নামকরণ হয় টাটা বারোস। এই ঘটনাটি টিসিএসের অবস্থানটিকে জটিল করে তোলে। তাদের সামনে তখন দুটি উপায় খোলা ছিল— এক, নিজেদের অস্তিত্ব গুটিয়ে দিয়ে টাটা বারোসের মধ্যে ঢুকে যাওয়া এবং দুই, টাটা বারোসের পাশাপাশি আলাদা একটি কোম্পানি হিসেবে নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখা, যে ক্ষেত্রে এতদিন তারা যাদের সঙ্গে মিলে এবং বহুলাংশে যাদের ওপর নির্ভর করে ব্যাবসা করছিল, সেই বারোসকে ছেড়ে অন্যদের সঙ্গে তাদের ব্যাবসা করতে হবে। কোন পথে যাওয়া হবে এই নিয়ে টাটা গোষ্ঠীর অভ্যন্তরে কিছুদিন টানাপোড়েন চলে। শেষপর্যন্ত ঠিক হয় টাটা বারোস এবং টিসিএস, দুটি কোম্পানিই পাশাপাশি থাকবে। আবার পিছন ফিরে দেখলে বারোসের সঙ্গে বিচ্ছেদের এই ঘটনাটিকে টিসিএস তথা ভারতীয় তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পের একটি মাইলফলক বলতে হবে, যদিও সেই মুহূর্তে এই ব্যবস্থা টিসিএসের পথ চলাকে অনেকটা কঠিন করে দিয়েছিল। এতদিন বিদেশে ব্যাবসা ধরার কাজটি টিসিএসের জন্য বারোস করে দিত, কিন্তু এবার থেকে টিসিএস-কে নিজেকেই সেই কাজ করতে হবে, শুধুমাত্র প্রযুক্তিগত ও বৌদ্ধিক ব্যুৎপত্তি দেখালেই হবে না, তার সাহায্যে সম্ভাব্য বিদেশি ক্লায়েন্টের সামনে দাঁড়িয়ে নিজেদের কথা বলে ও প্রতিষ্ঠা করে তাদের আস্থা অর্জন করে, নতুন ব্যাবসা জোগাড় করতে হবে।

সেই দিকে চোখ রেখে টিসিএসের প্রথম আমেরিকার অফিসটি খোলা হয় ১৯৭৯ সালে নিউইয়র্ক শহরে। এর আগেই ১৯৭৪ সালে ইংলন্ডে খুলেছিল টিসিএসের প্রথম বিদেশি অফিসটি।

আশির দশক থেকে শতাব্দীর মোড়

এরপর আশির দশকের গোড়ার দিকে ভারতীয় তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পের অন্যান্য বড়ো কোম্পানগুলির আবির্ভাব ঘটতে থাকে যথা উইপ্রো[৪], ইনফোসিস, ইত্যাদি। এ ছাড়াও আরো অনেক কোম্পানি, ছোটো বড়ো মাঝারি, কেউ কেউ তথ্যপ্রযুক্তির সমস্ত রকম কাজ করতে, কেউ আবার কোনো অংশের ওপর বিশেষ চর্চা ও ব্যুৎপত্তি নিয়ে, এই শিল্পকে গত প্রায় চার দশক সমৃদ্ধ করেছে, সারা পৃথিবীর আস্থা অর্জন করেছে, সেই সূত্রে আয় করেছে প্রচুর, দেশের বিদেশি মুদ্রার ভাণ্ডার স্ফীতকায় করেছে, অসংখ্য সাধারণ ঘর থেকে উঠে আসা মেধাবী ছেলেমেয়ের জন্য একটা ভালো চাকরির দরজা খুলে দিয়েছে।

আশির দশকের শুরু থেকে দ্রুত বড়ো হয়েছে তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পের পরিধি। নতুন নতুন কোম্পানি ভারতীয় তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পের গ্রাহক হয়েছে, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে অফিস খুলেছে, কাজের ধরনের পরিধিও বেড়েছে ক্রমাগত। এ ছাড়াও, প্রতিটি দশকে কিছু দুনিয়া-বদলানো প্রযুক্তি মানুষের হাতে এসেছে এবং

তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে দ্রুত এগিয়েছে, পালটেছে তথ্যপ্রযুক্তি শিল্প। এই সময়ে দশকভিত্তিক এই শিল্পের অগ্রগতি নিয়ে বড়ো গবেষণামূলক এবং একই সঙ্গে সাধারণ পাঠকের জন্য আকর্ষণীয় লেখা, লেখা সম্ভব এবং প্রয়োজন। কিন্তু সেই দীর্ঘ বর্ণনার পরিসর এই লেখায় নেই, অন্য কোনো প্রসঙ্গে অন্য কোনো সময় সে আলোচনা করা যাবে। তবে আমাদের এই লেখার স্বার্থে এই চার দশকের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা আমরা সংক্ষেপে দেখে নেব, এরকম কয়েকটি ঘটনা যেগুলোর কথা আমরা অনেকেই কমবেশি জানি। বর্তমান অংশে দেখব ২০০০ সাল পর্যন্ত প্রধান দুটি ঘটনা।

প্রথমত বলতে হয় পার্সোনাল কম্পিউটার বা পি সি-র কথা। প্রথম দিকে কম্পিউটার ব্যাপারটা ছিল একটা ঘরজোড়া যন্ত্র। বানানোর খরচ এবং প্রযুক্তির ও ব্যবহারের তুলনামূলক অপ্রতুলতার কারণে কম্পিউটার ছিল একটি অতি বিশিষ্ট ও দামি যন্ত্র এবং এর ব্যবহার সীমিত ছিল বড়ো বড়ো কোম্পানি ও গবেষণা সংস্থার অন্দরে, লোকচক্ষুর অন্তরালে ও অত্যন্ত দক্ষ প্রযুক্তিবিদদের হাতে। এদের বাইরে বেশিরভাগ লোকের কোনোদিন কোনো কম্পিউটার দেখার অভিজ্ঞতাই হয়নি। কিন্তু আশির দশকের শুরু থেকে কম্পিউটার তৈরির প্রযুক্তির উন্নতি অনেক ছোটোর মধ্যে শক্তিশালী কম্পিউটার তৈরি করতে সাহায্য করল। এই অগ্রগতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে একাধারে কমল কম্পিউটারের আয়তন ও দাম যার ফলে পৃথিবীতে আবির্ভাব ঘটল ব্যক্তিগত তথা পার্সোনাল কম্পিউটারের (পি সি)। আশির দশকের মধ্যে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ব্যক্তিগত কম্পিউটার পৌঁছে গেল এবং তার পরের এক দশকের মধ্যে বহু মানুষের হাতে পৌঁছে গেল। এর পাশাপাশি, দীর্ঘদিনের গবেষণার ফসল হিসেবে নব্বই দশকের মাঝামাঝির মধ্যে বহু মানুষের হাতে পৌঁছে গেল ইন্টারনেট। ইন্টারনেটের মাধ্যমে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হল কম্পিউটারের ছোটো ছোটো জাল বা নেটওয়ার্ক, যার থেকে এর নাম হয়েছে 'ইন্টারকানেক্টেড নেটওয়ার্ক' বা অন্তর্জাল। এবং এই অন্তর্জালের মাধ্যমে পৃথিবীর বহু কম্পিউটার পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হল, হাজার হাজার মাইলের দূরত্ব ঘুচিয়ে নিজেদের মধ্যে বার্তা আদান-প্রদান করতে সক্ষম হল। এ এক আশ্চর্য মায়াজাল বলা যায়, শুধু ব্যাপারটা মায়া নয়, ঘোর বাস্তব। একটি ঘরের মধ্যে একটি ইন্টারনেটে যুক্ত কম্পিউটার মুহূর্তে একজন মানুষের দুনিয়াকে অনেক বড়ো করে দিল। পরবর্তীকালের বহু প্রযুক্তি যেমন ইমেইল, গুগ্‌লের মতো সবজান্তা সার্চ-ইঞ্জিন বা টুইটার-ফেসবুকের মতো সামাজিক মাধ্যম সবেরই মূল ভিত্তি ইন্টারনেট। আজ তো ইন্টারনেট ও সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করে বাণিজ্য বিনোদন থেকে এমনকী কিছু দেশে বিপ্লবও সংগঠিত হচ্ছে, যুগ যুগ ধরে গড়ে ওঠা মানুষের বিপুল জ্ঞানভাণ্ডার ও লাইব্রেরি ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সীমানা ছাড়িয়ে সহজেই পৌঁছে যাচ্ছে পৃথিবীর প্রত্যন্ত কোণের উৎসাহী ছাত্র বা গবেষকের কাছে। পাশাপাশি এর বিপুল ক্ষমতা মানবজাতির ওপর অনেক ক্ষতিকর প্রভাবও ফেলছে। সেই লাভক্ষতির তুলনামূলক হিসেব করা অন্য চর্চা, অন্য লেখার বিষয়।

ব্যক্তির পাশাপাশি পার্সোনাল কম্পিউটার ও ইন্টারনেট তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পেও একটি নতুন ও অতি গুরুত্বপূর্ণ মাত্রা নিয়ে এল। আগে একটি কোম্পানির পেছনের দিকের গুরুত্বপূর্ণ কিছু কাজ হত কম্পিউটারে, অল্প কিছু দক্ষ লোকের হাতে। এখন পার্সোনাল কম্পিউটারের সাহায্যে সংস্থার আরো অনেক কর্মীর হাতে কম্পিউটার এল ও তারা পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হল। ইন্টারনেটের আবির্ভাবে মূল ব্যাবসার অনেকটা কাজও ইন্টারনেটের সাহায্যে হওয়া সম্ভব হল। ব্যক্তি গ্রাহক তার ঘরের কম্পিউটারে বসে একটি কোম্পানির জিনিস কিনতে সক্ষম হল, ট্রেনের টিকিট কাটতে শুরু করল। এর সঙ্গে সংযুক্ত সফটওয়্যার প্রযুক্তিরও একটি বিস্ফোরণ ঘটল, আরো অনেক প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ এল। এর সম্মিলিত ফলস্বরূপ তথ্যপ্রযুক্তির কাজের বহর ও ধরন বেড়ে গেল। অন্যদিকে তথ্যপ্রযুক্তির একই কাজের জন্য নিযুক্ত একটি দল আগের থেকে আরো অনেক সহজেই দেশে ও বিদেশে বিভক্ত হয়ে কাজ করতে সক্ষম হল। এর ফলে ইয়োরোপ আমেরিকার কোম্পানিগুলির কাছে আউটসোর্সিং-এর প্রস্তাব করা সহজতর হল, বিরাট প্রসার ঘটল ভারতীয় তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পের।

পার্সোনাল কম্পিউটার ও ইন্টারনেটের দ্বৈত প্রযুক্তির পরই বলা দরকার 'ই-কমার্স'-এর প্রসারের কথা। ই-কমার্স অর্থাৎ ইলেকট্রনিক কমার্স তথা বৈদ্যুতিন বাণিজ্য। যখনই ইন্টারনেট-সমৃদ্ধ একটি কম্পিউটার ব্যক্তি মানুষের বাড়িতে পৌঁছে গেল, তখন এটা সহজেই অনুমেয় যে এই আশ্চর্য প্রযুক্তির ব্যবহার শুধু জ্ঞানান্বেষণ ও কৌতূহল নিবারণে সীমিত থাকবে না। এই অগ্রগতির একটি স্বাভাবিক পরবর্তী ধাপ হিসেবে সেই ব্যক্তি মানুষের বাড়িতে ঢুকল ব্যবসায়ীরা, শুধু লাইব্রেরি নয়, এই প্রযুক্তির হাত ধরে দোকানও চলে এল বাড়িতে!

ই-কমার্সের কেন্দ্রে আছে একটি ব্যবসায়ী সংস্থার ওয়েবসাইট ('অন্তর্জালপত্র' বলা যায় কি?)। এই পাতায় কোম্পানিটি তার পণ্যের নাম দাম ছবি ইত্যাদি সংক্রান্ত একটি তালিকা প্রকাশিত রাখে। কোনো ব্যক্তি যখন জেনে বা না জেনে এই ওয়েবসাইটটিতে পৌঁছন তখন তিনি এই পণ্যের তালিকা দেখতে পান এবং তার কোনোটা কিনতে চাইলে কিনতে পারেন। ই-কমার্সের দ্বিতীয় অংশে আছে এই ওয়েবসাইটটির মাধ্যমে দাম দেওয়া। এই কাজের জন্য বিপণনি

ওয়েবসাইটটির সঙ্গে একটি সমঝোতা থাকতে হয় একটি ব্যাঙ্ক বা কোনো অর্থকরী সংস্থার। ক্রেতা যখন দাম দেওয়ার বোতামটি টেপেন তখন সেই সংস্থাটির মাধ্যমে বৈদ্যুতিন উপায়েই ক্রেতার ব্যাঙ্ক থেকে (বা ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে) পণ্যটির দাম বাবদ নির্ধারিত অর্থ বিক্রয়কারীর ব্যাঙ্কে চলে যায়। ই-কমার্সের শেষ অংশে আছে কেনা জিনিসটি (যদি সেটি একটি বস্তু হয়) ক্রেতার কাছে পৌঁছে দেওয়া যেটি বিক্রয়কারী সংস্থাটি হয় নিজে না হলে আরেকটি কোনো সংস্থার মাধ্যমে করে। আর যদি বস্তুর বদলে কোনো সুবিধা বা পরিষেবা (যেমন ট্রেনের টিকিট, হোটেলের ঘর, ইত্যাদি কেনা হয় তা হলে ক্রেতার কাছে পৌঁছনোর কোনো প্রয়োজন থাকে না, ওয়েবসাইট থেকে বেরোনো একটি প্রমাণ প্রিন্টার থেকে ছাপিয়ে নিলেই চলে (আজকাল স্মার্টফোনে নিয়ে গেলেও হয়)।

বৈদ্যুতিন বাণিজ্যের এই ব্যবস্থাটি ক্রমশ ফুলে ফেঁপে উঠতে থাকে এবং আক্ষরিক অর্থেই প্রায় আলপিন থেকে হাতির কেনাবেচা সম্ভব হয়ে ওঠে নিজের ঘরের কম্পিউটারের সামনে বসে। এর বিপুল প্রভাব পড়ে ব্যাবসা-বাণিজ্যের দুনিয়ায়। একের পর এক সংস্থা তাদের পণ্য বেচার জন্য এই অন্তর্জালপত্রের সাহায্য নিতে থাকে। অনেক ব্যাবসার ক্ষেত্রে দোকান কমে যেতে থাকে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে নতুন ব্যবসায়ীদের আবির্ভাব ঘটে যাদের কোনো দোকানই নেই, বা পুরো দোকানটাই তাদের ওয়েবসাইট। সবচেয়ে বড়ো উদাহরণ সম্ভবত অ্যামাজন, যাদের ওয়েবসাইটে প্রতিনিয়ত অসংখ্য মানুষ সারা পৃথিবী থেকে কিছু না কিছু জিনিস কিনছে, যদিও তাদের নিজের কোনো দোকান নেই। অনেক পুরোনো বড়ো সংস্থা এই ব্যবস্থার সঙ্গে খাপ খাওয়াতে না পেরে উঠে যায় যেমন আমেরিকার বিখ্যাত বইয়ের দোকান 'বর্ডার্স'। সারা মার্কিন দেশ জুড়ে ছড়িয়ে থাকা একসময়ের এই বিখ্যাত ব্যাবসাটি ই-কমার্সের চাপ যুঝতে না পেরে ঝাঁপ ফেলে ২০১১ সালে। মোটকথা, কেনাবেচাকে সহজ করে দেওয়া শুধু নয়, ই-কমার্স হাজার হাজার বছর ধরে চলে আসা বাণিজ্যের কাঠামোটিকেই চ্যালেঞ্জ জানায়, বদলে দেয়। এবং এই পরিবর্তনের মূল চালিকাশক্তি তথ্যপ্রযুক্তি। এবং পার্সোনাল কম্পিউটার-ইন্টারনেট-ই-কমার্সের ফলস্বরূপ তথ্যপ্রযুক্তির কাজেও আসে নতুন মাত্রা, যেখানে তথ্যপ্রযুক্তি শুধু কোনো বড়ো সংস্থার সারাদিনের লেনদেনের হিসাবরক্ষার পিছনে থাকা বৃহৎ ইঞ্জিন হিসেবে কাজ করে না, সে ঢুকে পড়ে ইন্টারনেটের উন্মুক্ত হাইওয়ের ওপর দিয়ে হয়ে চলা ক্রেতা ও বিক্রেতার, পরিষেবাদাতা ও গ্রহীতার সরাসরি ও তাৎক্ষণিক সওয়াল-জবাবের মধ্যে। তথ্যপ্রযুক্তির কাজের মধ্যে সংযোজন ঘটে নতুন ওয়েবসাইটের নকশা বানানো ও সেগুলি নির্মাণ করা, এমনভাবে যাতে সেগুলি একইসঙ্গে কার্যকরী ও আকর্ষণীয় হয়, বার্তাপ্রবাহের দ্রুততা বাড়ানো, ইন্টারনেটে তাৎক্ষণিক অর্থনৈতিক লেনদেনগুলিকে সুরক্ষিত করা, ইত্যাদি।

তথ্য প্রযুক্তির ক্ষেত্রে গত শতাব্দীর শেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাটি বলা যেতে পারে ওয়াই ২কে (Y2K)-র প্রভাব বা ওয়াই২কে বিভ্রাট। সামান্য একটি অদূরদর্শিতা কীরকম পৃথিবীব্যাপী প্রভাব ফেলতে পারে ও আতঙ্ক তৈরি করতে পারে তার একটি মোক্ষম উদাহরণ এই ওয়াই২কে বিভ্রাট। আগে এই সংকেতটির মানে বুঝে নেওয়া যাক। প্রথমে আছে ইংরেজির 'Y' যা এক্ষেত্রে 'Year' শব্দটির আদ্যক্ষর; তারপর '2K' অংশটি একসঙ্গে পড়তে হবে, যার এক্ষেত্রে অর্থ '2000' কারণ 'K' অক্ষরটি অনেকসময় হাজার সংখ্যাটি বোঝানোর জন্য ব্যবহার করা হয়। দুইয়ে মিলে দাঁড়ানো 'year 2000' বা ২০০০ সাল। অতএব 'ওয়াই ২কে' সমস্যাটিকে বলা যায় ২০০০ সালের সমস্যা। তা একটি বিশেষ সালে হঠাৎ সমস্যা হবে কেন? ব্যাপারটা একদিক থেকে ছোটো এবং কিছুটা মজার। সাত-সত্তর-আশির দশকে লেখা অসংখ্য প্রোগ্রাম যেগুলি নব্বইয়ের শেষদিকে রমরম করে চলছে এবং বহু বিশাল ব্যাঙ্ক, বিমা এবং আরো বহু সংস্থার প্রাণভোমরা, সেই প্রোগ্রামগুলি লেখার সময় তাদের স্রষ্টারা একটা ছোটো জিনিস ভুলে গিয়েছিলেন বা উপেক্ষা করেছিলেন। আমরা অনেক সময়ই তারিখে সালের অংশটা লিখি শুধু বছরটি দিয়ে, শতাব্দী লিখি না। উদাহরণস্বরূপ পঁচিশে অক্টোবর ১৯৭৫ দিনটিকে এই নিয়মে আমরা লিখব ২৫/১০/৭৫, শেষ অংশে সালের জন্য এক্ষেত্রে ১৯৭৫-এর, ২০৭৫ বা ১৮৭৫-এর নয়। তা ওই প্রোগ্রামগুলির লেখকরাও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে প্রোগ্রামে তারিখ লেখার জন্য ওই একই ব্যবস্থা করেছিলেন। ব্যাপারটি ৩১-ডিসেম্বর-১৯৯৯ পর্যন্ত কোনো সমস্যার সৃষ্টি করবে না, কিন্তু যেই শতাব্দী ঘুরে পরের দিনের তারিখ দাঁড়াবে ১/১/২০০০, তখনই হবে মুশকিল কারণ কম্পিউটারের খাতায় সেই তারিখটি লেখা হবে ১/১/০০ হিসেবে। কম্পিউটারের পক্ষে বোঝা সম্ভব হবে না শেষের ওই '০০'-টির অর্থ কী। এতদিন নতুন বছর এলে সালের ঘরে এক যোগ হত, যাকে স্বাভাবিক ধরে প্রোগ্রামগুলিতে অনেকগুলি ধাপে কাজ হত, এবার হঠাৎ ৯৯-এর পর চলে আসবে ০০! প্রোগ্রামগুলির নির্দেশ কাজ করবে না। অনেক ক্ষেত্রে প্রোগ্রামগুলি বসে যাবে, অনেকক্ষেত্রে ভুল ফলাফল দেবে, কম্পিউটারের ওপর নির্ভরশীল ব্যাঙ্ক বিমা ইত্যাদি সংস্থাগুলিতে (পৃথিবীর প্রায় সমস্ত বড়ো ব্যাঙ্ক ও বিমার হিসেবনিকেশ ততদিনে কম্পিউটার-চালিত হয়ে গেছে) রাতারাতি মারাত্মক আপৎকাল উপস্থিত হবে। ভাগ্য ভালো যে নব্বই দশকে এই ঘটনাটি কম্পিউটার প্রোগ্রামারদের চোখে পড়ে, আর তাই প্রচুর

উদ্‌বেগ ও আতঙ্ক তৈরি হলেও সমস্যাটির সমাধান করার যথেষ্ট সময় পাওয়া যায়।

এই টাইম বোমাস্বরূপ সমস্যাটি আবিষ্কৃত হওয়ার পরেই এর সমাধানের জন্য কোম্পানিগুলি উঠে পড়ে লাগে এবং ডাক পড়ে ভারতীয় তথ্যপ্রযুক্তির সংস্থাগুলির। তাদের জন্য ওয়াই ২কে নিয়ে আসে বিশাল ব্যাবসাবৃদ্ধির সুযোগ যার উদাহরণ হিসেবে বলা যায় নব্বই দশকের দ্বিতীয়ার্ধে টি সি এস-এর ব্যাবসার পরিমাণ প্রায় সাড়ে তিনগুণ বৃদ্ধি পায়। একইরকমভাবে আয় বৃদ্ধি হয় ভারতীয় তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পের অন্যান্য বড়ো সংস্থাগুলিরও। এবং তাদের চেষ্টায় শেষপর্যন্ত নির্বিঘ্নে অতিক্রান্ত হয় শতাব্দীবদলের পালাটি। আমরা পৌঁছই নতুন শতাব্দীর প্রথম ভোরে।

নতুন শতাব্দীতে তথ্যপ্রযুক্তি

তথ্যপ্রযুক্তির তিনদশকের অগ্রগতির একটা দ্রুত-পরিক্রমা সম্পন্ন করে আমরা এসে পৌঁছেছি একুশ শতকের ঊষালগ্নে এবং আমাদের এই ইতিহাসযাত্রার শেষ অংশে। এই অংশে আমরা দেখে নেব একুশ শতাব্দীর প্রথম দুই দশকে আমাদের সামনে আসা কিছু নতুন প্রযুক্তি, যা সম্মিলিতভাবে, বলা হচ্ছে, আমাদের দাঁড় করিয়েছে চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের মুখে। প্রথম শিল্পবিপ্লব অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর যন্ত্রবিপ্লব যখন বাষ্পশক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করা ও অন্যান্য যান্ত্রিক অগ্রগতি শিল্প-উৎপাদনে অভূতপূর্ব গতি ও শক্তি নিয়ে আসে, যার ফলে মানুষের জীবনযাত্রায় বিপুল পরিবর্তন ঘটে; এরপর ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ থেকে বিংশ শতাব্দীর শুরুর মধ্যে ঘটে দ্বিতীয় শিল্পবিপ্লব, যার কেন্দ্রে ছিল বিদ্যুতের ক্রমবর্ধমান ব্যবহার, টেলিফোনের আবিষ্কার, ইত্যাদি। তৃতীয় শিল্পবিপ্লবের কেন্দ্রে ছিল কম্পিউটারের আবিষ্কার, ক্রমবর্ধমান ব্যবহার ও পরে পার্সোনাল কম্পিউটার ও ইন্টারনেটের আবিষ্কার, যার কথা আমরা একটু আগেই আলোচনা করেছি। অর্থাৎ এই হিসেব অনুযায়ী গত শতাব্দী আমরা শেষ করেছি তৃতীয় শিল্পবিপ্লব অবধি পাওয়া উপকরণ ও তাদের দ্বারা নির্ধারিত জীবনযাত্রা দিয়ে। এরপর গত দুই দশকে অনেকগুলি নতুন প্রযুক্তিতে অগ্রগতি হয় যার দ্বারা মনে করা হচ্ছে আমাদের জীবনযাত্রায় মৌলিক কিছু পরিবর্তন আসছে এবং আসবে।

এক্ষেত্রে প্রথমেই বলা দরকার মোবাইল ফোনের কথা। ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে অনেক বিজ্ঞানী ও গবেষকের কাজের সম্মিলিত ফসল হিসেবে টেলিফোন যন্ত্রটির আবিষ্কার হয়। ১৮৭৬ সালে এই যন্ত্রটির প্রথম পেটেন্ট পান মার্কিন বিজ্ঞানী আলেক্সান্ডার গ্রাহাম বেল। এরপর ওই বছরই হাঙ্গেরিয়ান প্রযুক্তিবিদ তিবাদের পুসকাস আবিষ্কার করেন টেলিফোন সুইচ ও তার পরবর্তী পদক্ষেপ হিসেবে টেলিফোন এক্সচেঞ্জ। এরপরের একশো বছরেরও বেশি সময় টেলিফোন বলতে মানুষ ঘরের কোণে রাখা একটা আশ্চর্য যন্ত্র বুঝত যেখানে কিছু ফুটোর মধ্যে আঙুল রেখে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে একটা নম্বর 'ডায়াল' করতে হত যে নম্বরের টেলিফোনটি বেজে উঠত অন্য পাড়া বা অন্য শহর বা অন্য কোনো দেশের একটি ঘরে আর এই দুটি ফোনের রিসিভারের দুপ্রান্তের মানুষ একে অপরের কথা শুনতে পেত। পর পর অনেকগুলি তার দিয়ে যুক্ত থাকত এই ফোন দুটি এবং শব্দ প্রবাহিত হত এই তারের মধ্যে দিয়ে। টেলিফোন আবিষ্কারের পরের একশো বছরে এই প্রযুক্তির মূলগত খুব একটা কিছু পরিবর্তন হয়নি।

এরপর আশির দশক থেকে ধীরে ধীরে মোবাইল ফোনের প্রসার ঘটতে থাকে এবং বিংশ শতাব্দীর শেষে প্রযুক্তির ভালোই প্রসার পায়, যদিও তখনও পর্যন্ত ব্যবহারের দাম অনেক বেশি হওয়ায় ভারতের মতো দেশে মোবাইল ফোনকে একটি বিলাসিতা হিসেবেই দেখা হত। তারপর একুশ শতকের প্রথম দশকের মধ্যে প্রযুক্তির উন্নতি ও ব্যাপক প্রসার এবং ব্যবসায়িক প্রতিযোগিতায় দাম কমে গিয়ে বাকি পৃথিবীর সঙ্গে সারা ভারতবর্ষেও ছড়িয়ে পড়ে মোবাইল ফোন।

এই মোবাইল ফোন বা সেলফোন প্রযুক্তি ফোন যন্ত্রটিকে তারের বন্ধন থেকে মুক্ত করে দেয়। বিভিন্ন স্যাটেলাইট ও অ্যান্টেনার সাহায্যে তড়িৎ-চৌম্বকীয় তরঙ্গে চেপে বার্তা চলে যায় এক ফোন থেকে আরেক ফোনে। কথা বলার জন্য আর যন্ত্রের সামনে থাকার প্রয়োজন নেই, যন্ত্রটিই আপনার সঙ্গে ঘুরতে থাকবে। প্রথমে এই প্রযুক্তিটি ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির যোগাযোগে একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনল। ধীরে ধীরে জীবন থেকে উধাও হল বাসস্টপে বন্ধুর জন্য অনিশ্চিত অপেক্ষা, এস টি ডি বুথের সামনে লাইন, দৈনন্দিন জীবনের আরো অনেক কিছু। কিন্তু অচিরেই এই প্রযুক্তিটি শুধু ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির কথা বা বার্তা আদানপ্রদানের মধ্যে সীমাবদ্ধ রইল না। কম্পিউটার বিজ্ঞান, যোগাযোগ বিজ্ঞান ও তথ্যপ্রযুক্তির সম্মিলিত গবেষণায় এই মোবাইল যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রসারিত হয়ে হাতের ফোনটিকে করে তুলল একটি ছোটো কম্পিউটার। হাওয়ায় ভেসে চলা তড়িৎ চৌম্বকীয় তরঙ্গের পিঠে চাপিয়ে যেমন মানুষের কণ্ঠস্বর পাঠানো যায় তেমনই ছবি, লেখা, এককথায় যে-কোনো রকম বৈদ্যুতিন তথ্যই (ইলেকট্রনিক ডেটা) পাঠানো সম্ভব। এবং ফোনটিতে কম্পিউটারের মতো একটি প্রসেসর (কম্পিউটারের মস্তিষ্ক) ও একটি একটু বড়ো স্টোরেজ (বৈদ্যুতিন তথ্য সঞ্চিত রাখার গুদামঘর) যোগ করে ইন্টারনেটে যুক্ত করতে পারলে, ইন্টারনেটের দুনিয়ার যাবতীয় তথ্য বাড়ির কম্পিউটারের মতো আপনার ফোনটিতেও পাওয়া যাবে। ব্যস, এরপর যন্ত্রটিতে সামান্য কিছু বাহ্যিক পরিবর্তন

করে নিতেই— যেমন একটু বড়ো স্ক্রিন, স্পর্শে কাজ করা কি-প্যাড, ইত্যাদি— হাতের ফোনটি একটি ছোটো কম্পিউটারে বদলে গেল। অর্থাৎ একটি কম্পিউটার সঙ্গে নিয়ে রাস্তাঘাটে ঘোরাফেরা শুরু করল মানুষজন। ফোন পালটে হয়ে গেল 'স্মার্টফোন', অর্থাৎ বুদ্ধিমান ফোন। এবং প্রযুক্তির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে জিনিসটির দামও মোটামুটি নিম্নবিত্তরও নাগালের মধ্যে চলে এল। অচিরেই পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে পড়ল স্মার্টফোন এবং কম্পিউটারের তুলনায় এর দাম অনেক কম এবং ব্যবহার অনেক সরল হওয়ায় ইন্টারনেটের দুনিয়া আরেকটা বিপুল সংখ্যক জনতার হাতের মধ্যে চলে এল।

স্মার্টফোনের আবির্ভাবের ফলে তথ্যপ্রযুক্তির ক্ষেত্রেও নতুন কাজ যোগ হল। যে ওয়েবসাইটগুলি আগে শুধু কম্পিউটারে চলত তাদের অনেকগুলিকেই স্মার্টফোনের উপযুক্ত করতে হল, অনেক ক্ষেত্রে তাদের জন্য নতুন প্রোগ্রাম লিখতে হল, যেগুলির নাম হল 'অ্যাপ'। প্রায় সমস্ত সরকারি ও বেসরকারি উপভোক্তামুখী ওয়েবসাইট, যেগুলি ব্যবহার করে মানুষ কিছু না কিছু কাজ করত, তাদের একটি করে স্মার্টফোনের উপযুক্ত অ্যাপ তৈরি হল, সে ট্রেনের টিকিট কাটাই হোক, বা আয়কর জমা দেওয়া বা কেনাকাটার জন্য অ্যামাজন বা ফ্লিপকার্ট। এ ছাড়া কিছু অ্যাপ তৈরি হল শুধুমাত্র স্মার্টফোনের জন্য যেমন সামাজিক মাধ্যম হোয়াটসঅ্যাপ বা ট্যাক্সি ডাকার জন্য উবার বা ওলা। স্মার্টফোনের হাত ধরে ই-কমার্সের হাত আরো বহু প্রসারিত হল, ব্যাবসার একটা নতুন দিগন্ত খুলে গেল। উদাহরণ, আজ নিজেদের কোনো হোটেল বা ট্যাক্সি ছাড়াই পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ হোটেল ও ট্যাক্সি ব্যবসায়ী এয়ারবিএনবি এবং উবার।

এই সময়ের তথ্যপ্রযুক্তির চর্চার একটি অন্যতম বিষয় কৃত্রিম মেধা বা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স। বৈদ্যুতিন মাধ্যমে সংরক্ষিত বিপুল ঐতিহাসিক তথ্যের (এক্ষেত্রে তথ্য বলতে রাশি ধ্বনি ছবি লেখা, সবই বোঝাচ্ছে) দ্রুত ও তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে ক্রমাগত চেষ্টা চলছে কম্পিউটারকে নিজে থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ও কার্যকরী পরামর্শ দেওয়ার যোগ্য করে তুলতে। দাবা খেলার শক্তিশালী কম্পিউটার আগের শতাব্দীতেই বেরিয়ে গিয়েছিল, হালে এমনকী কম্পিউটারের কৃত্রিম মেধার সাহায্যে চালকহীন গাড়িও আবিষ্কৃত হয়েছে ও রাস্তার পরীক্ষিত হচ্ছে, বাণিজ্যিক প্রসার মনে হয় সময়ের অপেক্ষা। এ ছাড়া আরো বহু ব্যবহার ইতিমধ্যেই হচ্ছে এবং আরো বেশি করে হবে।

এগুলি ছাড়াও ইন্টারনেট অফ থিংস বা ব্লকচেইনের মতো প্রযুক্তি নিয়ে জোরকদমে কাজ চলছে। প্রত্যেকটার বিবরণ দিয়ে এই লেখার বহর বাড়াব না, কিন্তু এটুকু প্রিয় পাঠকের কাছে নিশ্চয়ই সহজেই বোধগম্য হবে যে এই প্রযুক্তি সমূহের মিলিত প্রভাবে আমাদের দৈনন্দিন জীবন ইতিমধ্যেই অনেকাংশে প্রভাবিত হয়েছে, অনেক পুরোনো অভ্যেসের জায়গা নিয়েছে নতুন অভ্যেস, এবং আগামী কয়েক বছরে আরো হবে। আমরা যেভাবে পড়ি, যেভাবে শিখি, যেভাবে গান শুনি, যেভাবে বন্ধুদের সঙ্গে যোগাযোগ করি, যে দ্রুততায় খবর পাই, সেগুলি সবই অনেক পালটে গেল আমাদেরই চোখের সামনে। যারা বয়সে একটু বড়ো তারা দুটোই দেখেছে, যারা নব্বইয়ের দশকে বা এই শতাব্দীর গোড়ার দিকে জন্মেছে তাদের কাছে পুরোনো অভ্যেস বা উপাদানগুলি বাপ দাদাদের কাছে শোনা ইতিহাসমাত্র।

এ প্রসঙ্গে এ-কথা মনে রাখা প্রয়োজন যে শিল্পের এই বিপুল অগ্রগতি সত্ত্বেও পৃথিবীতে এখনও বহু মানুষ আছেন যাঁদের কাছে প্রথম শিল্পবিপ্লবের সুবিধাটুকুও গিয়ে পৌঁছয়নি। এর থেকে এ-কথাই মনে হয় যে শিল্পের অগ্রগতি সমাজের বিপুল বৈষম্য দূর করার জন্য যথেষ্ট নয়, তার জন্য উন্নততর মন আবেগ ইচ্ছা ও পরিকল্পনার প্রয়োজন যা একটি ভিন্ন আলোচনার বিষয়।

এই অংশের শেষে শুধু এইটুকুর দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইব যে এই বিপুল প্রযুক্তিগত অগ্রগতির সঙ্গে ভারতীয় তথ্যপ্রযুক্তি শিল্প ক্রমাগত তাল মিলিয়ে চলেছে ও ক্রমশ স্ফিতকায় হয়েছে। ষাটের দশকের পাঞ্চকার্ডের যুগ থেকে আজকের স্মার্টফোনের জমানা পর্যন্ত যে লম্বা ও রোমাঞ্চকর যাত্রা, তা সাফল্যের সঙ্গে পাড়ি দিয়েছে ভারতীয় তথ্যপ্রযুক্তি শিল্প এবং এই সময়ের মধ্যে কয়েকজন থেকে বেড়ে এই শিল্পের কর্মীসংখ্যা দাঁড়িয়েছে প্রায় চল্লিশ লক্ষে এবং তথ্যপ্রযুক্তির বণিকসভা ন্যাসকমের পূর্বাভাস ২০২৫-এর মধ্যে এই শিল্পে আরো পঁচিশ থেকে তিরিশ লক্ষ নতুন চাকরি যোগ হবে[৫]। আজ শুধু ভারতীয় কোম্পানিগুলি নয়, বিশ্বের অন্যান্য প্রসিদ্ধ তথ্যপ্রযুক্তি কোম্পানিগুলিও— আইবিএম, অ্যাকসেনচিওর, ক্যাপ জেমিনি, ইত্যাদি— তাদের কর্মীদের সিংহভাগ নিয়োগ করে ভারত থেকে এবং এদের সবারই ভারতে বড়ো বড়ো অফিস আছে। প্রযুক্তি ও মেধাশ্রমের ক্ষেত্রে এই বিশ্বজয়ী আস্থা-অর্জন এ-দেশের সাম্প্রতিক ইতিহাসের একটি নগণ্য বিষয় নয়।

তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পের বৈশিষ্ট্য ও ভারতে সামাজিক প্রভাব

আগের অংশগুলিতে তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পের গত পঞ্চাশ বছরের ইতিহাস ও সেই সূত্রে এই প্রযুক্তির কয়েকটি মূল মাইলফলক আমরা দেখার চেষ্টা করেছি। এই লেখার শেষ অংশে উপস্থিত হয়েছি আমরা, যেখানে আমরা দেখার চেষ্টা করব এই শিল্পের কিছু বৈশিষ্ট্য ও উল্লেখযোগ্য সামাজিক প্রভাব।

তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রের চাকরিকে অনেকেই মনে করেন, মোটামুটি ঠিকই, একটি লোভনীয় ও ঈর্ষণীয় চাকরি। অন্যান্য বহু ক্ষেত্রের তুলনায় এখানে সাধারণভাবে বেতন ভালো,

কাজের পরিবেশ ভালো, স্বাস্থ্যবিমা, প্রভিডেন্ট ফান্ড ইত্যাদি আছে। সাধারণভাবে শ্রমিকশ্রেণি বলতে ভারতে আমরা যা বুঝি, তাদের যা গড় জীবনযাত্রা, তার সঙ্গে তথ্যপ্রযুক্তি কর্মীদের জীবনযাত্রার মিল কম। সুতরাং বহু ক্ষেত্রে শ্রমিকদের যে দাবিদাওয়াগুলি থাকে, যা নিয়ে আন্দোলন হয়, মালিকপক্ষের সঙ্গে দর-কষাকষি চলে সেগুলি এখানে সাধারণভাবে অনুপস্থিত (যদিও হালে ছোটো কিছু কর্মচারী ইউনিয়ন তৈরি হয়েছে)। সুতরাং স্বয়ং তথ্যপ্রযুক্তির কর্মীরা, তাদের বাইরে ভারতের বৃহত্তর শ্রমিকশ্রেণি বা এর বাইরের যে বৃহত্তর সমাজ, তাঁদের প্রায় কেউই এদের ভারতের শ্রমিকশ্রেণির অন্তর্গত মনে করেন না। তা হলে এই কর্মীরা ঠিক কী, সে সম্পর্কেও অনেকের ধারণা অস্পষ্ট। শেষোক্ত অস্পষ্টতা এতক্ষণ এই লেখায় কিছুটা অন্তত দূর করা গেছে বলে আশা করছি। এবার এই শিল্পের কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের ওপর চোখ বুলিয়ে বাকি বিষয়গুলির ওপর সামান্য আলোকপাত করার চেষ্টা করছি।

উৎপাদন শক্তি ও সম্পর্কগুলির ওপর এক ঝলক

প্রথমেই বুঝে নেওয়া দরকার যে তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পের মূল নিয়মটা অন্যান্য যে-কোনো শিল্পের সঙ্গে একই। অর্থাৎ কিছু মানুষ তাঁদের মেধা ও শ্রমের ভিত্তিতে শিল্পের মূল পণ্যটি (এক্ষেত্রে সফটওয়্যার ও আনুষঙ্গিক) উৎপাদন করছেন এবং তাঁদের শ্রমের উদ্বৃত্ত (সরলভাবে, তাঁরা যে বাজারি মূল্য তৈরি করছেন তার থেকে তাঁদের বেতনের পর যা থাকে) থেকে অন্যান্য খরচ বাদ দেওয়ার পর যা পড়ে থাকে, তাই এই শিল্পের লাভের উৎস। এই অবধি অন্যান্য শিল্পের সঙ্গে এক হলেও এক্ষেত্রে একটা গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্যও আছে। তথ্যপ্রযুক্তির কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু কম্পিউটারের সাহায্যে মানুষের পক্ষে সময়সাপেক্ষ, অনেক ক্ষেত্রে বড়ো ও জটিল কিন্তু গতে বাঁধা কাজ, যতদূর সম্ভব করিয়ে নেওয়া। এর ফলে কাজটির সময় ও ভুলের সম্ভাবনা অনেক কমে যাবে, উৎপাদনশীলতা বাড়বে। আদর্শ অবস্থায় এর ফলে একঘেয়ে কাজ থেকে মানুষের শ্রম, মেধা ও সময় মুক্তি পাবে, সে আরো মানবিক চিন্তাভাবনায় সেগুলি ব্যয় করতে পারবে। কিন্তু মজার ব্যাপার এই যে মানুষের কাজকে যন্ত্র দিয়ে করানোটা তথ্যপ্রযুক্তির একটি কেন্দ্রীয় উদ্দেশ্য হলেও, তথ্যপ্রযুক্তি শিল্প নিজে প্রায় পুরোটাই মানুষের ওপর নির্ভরশীল। এই শিল্পের মূল কাঁচামাল মানুষের মেধা ও শ্রম। যন্ত্র বলতে একটি কম্পিউটার, ইন্টারনেট যোগাযোগ ও আনুষঙ্গিক সামান্য কিছু। এগুলো থাকলে এমনকী নিজের বাড়িতে বসেও কাজ করা যায়, যেমন এই শিল্পের অনেক কর্মী করে থাকেন। যেহেতু মানবসম্পদই এই শিল্পের প্রধান সম্পদ এবং অন্যান্য খরচ সেই তুলনায় নগণ্য, তাই কোম্পানিগুলির প্রধান খরচ কর্মীদের বেতন।

দ্বিতীয়ত তথ্যপ্রযুক্তি কর্মীদের সিংহভাগ থাকেন ভারতে, যেখানে জীবনযাপনের খরচ তুলনামূলকভাবে কম, কিন্তু কাজ করেন অর্থনৈতিকভাবে উন্নততম দেশগুলির (প্রধানত পশ্চিম ইয়োরোপ ও উত্তর আমেরিকার) গ্রাহকদের জন্য। সুতরাং পণ্যটির দাম বেশি কিন্তু তৈরির খরচ কম।

একদিকে মানুষের মেধা ও শ্রম ছাড়া অন্য খরচ সামান্য, অন্যদিকে উৎপাদিত পণ্যটির দাম যথেষ্ট বেশি, এই দুটি কারণের সম্মিলিত প্রভাবে অন্যান্য ভারী বা অত্যন্ত দামি যন্ত্রের ওপর নির্ভরশীল শিল্পের তুলনায় একইসঙ্গে তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পের লাভের শতাংশও বেশি, আবার কর্মচারীদের বেতনও বেশি। এর ফলে এঁদের ক্রয়ক্ষমতা, জীবনযাত্রা অনেক উন্নত এবং তাই উৎপাদন সম্পর্কের দিক থেকে এক হয়েও তথ্যপ্রযুক্তি কর্মীরা জীবনযাপন ও সংগ্রামের দিক থেকে ভারতের 'শ্রমিকশ্রেণির' অন্তর্গত হতে পারেননি। তার ওপর কাজটির জন্য যেহেতু প্রধানত মেধা লাগে তাই এঁরা কিছুদিন কাজ করার পর এক একটি বিষয়ের ওপর অনেকটা দক্ষ হয়ে ওঠেন এবং খুব সহজে পরিহার্য থাকেন না। অনেক বিশেষ দক্ষ কর্মী তো কোম্পানির সঙ্গে জোরদার দর কষাকষি করে আরো সুযোগ-সুবিধা আদায় করতে পারেন। চাকরি পালটে মাইনে বাড়িয়ে নেওয়ার সুযোগ এবং কোনো চাকরি গেলে নতুন চাকরি পাওয়ার সম্ভাবনাও অনেক বেশি।

তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পের আরেকটি বৈশিষ্ট্য এর তথাকথিত মালিক-শ্রমিক সম্পর্ক বা সেই সম্পর্কের অনুপস্থিতি, বিশেষত বড়ো কোম্পানিগুলির মধ্যে। এই কোম্পানিগুলির বেশিরভাগের ক্ষেত্রেই ওপর থেকে নীচ, প্রায় প্রত্যেকেই কর্মচারী, এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কোম্পানির উচ্চতম নেতৃত্ব একদম তলা থেকে শুরু করে ওপরে উঠেছে। উদাহরণস্বরূপ, এই লেখায় যাঁর বই থেকে অনেক তথ্য নেওয়া হয়েছে, সেই এস রামাদোরাই একদম নিচুতলায় কাজ শুরু করে শেষ অবধি টিসিএস-এর সিইও হয়েছিলেন, যেমন হয়েছিলেন তাঁর পরের সিইও এন চন্দ্রশেখরণ (অধুনা টাটা সন্সের চেয়ারম্যান)। সিইও অবশ্যই সবাই হবেন না, কিন্তু কোম্পানির মাঝের তলার থেকে ওপরতলার সব কর্মীই সাধারণত নিচুতলার থেকে কাজ করে এসেছেন। প্রবলভাবে মেধাভিত্তিক হওয়ায় এখানে হাতেকলমে কাজ করার অভিজ্ঞতাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং সেই অভিজ্ঞতা যাঁর নেই, তাঁর পক্ষে বাইরে থেকে ম্যানেজমেন্ট পড়ে এসে একটি তথ্যপ্রযুক্তি কোম্পানির মধ্য বা ওপরের স্তরের নেতৃত্বে যোগ দেওয়া মুশকিল। সুতরাং সবাই কর্মচারী, দলের নেতাও একজন কর্মচারী, যিনি বছরের শেষে তাঁর দলের সদস্যদের সারা বছরের কাজের মূল্যায়ন করেন, আবার তিনি নিজেও একটি বৃহত্তর দলের সদস্য যাঁর মূল্যায়ন করেন আবার সেই বড়ো দলটার নেতা। অনেক সময় মূল্যায়ন নিয়ে আপত্তি থাকতে পারে, কিন্তু সেটা একটা ব্যক্তিগত

বিচার, তার মধ্যে মালিক-শ্রমিক সম্পর্কের কোনো দিক থাকে না। অনেক সময় দেখা যায় কিছুদিন ম্যানেজমেন্ট বা পরিচালনা ধরনের কাজ করার পর অনেকে স্বেচ্ছায় ফিরে যেতে চাইছেন হাতেকলমে প্রযুক্তির কাজের দিকে। সব মিলিয়ে ব্যক্তিগত পছন্দ অপছন্দ থাকতে পারে, কিন্তু একটি তথ্যপ্রযুক্তি কোম্পানির কর্মচারীদের (বিশেষত বড়ো কোম্পানিগুলির ক্ষেত্রে) মালিকপক্ষ ও শ্রমিকপক্ষে ভাগ করা প্রায় অসম্ভব।

এসবের ফলে তথ্যপ্রযুক্তির কর্মীদের মধ্যে ক্ষোভ বিক্ষোভ দাবিদাওয়া ছিল অনেক কম, ইউনিয়নের মাধ্যমে কোম্পানির সঙ্গে দর-কষাকষিও ছিল প্রায় অনুপস্থিত।

অবশ্য গত কয়েক বছরে অবস্থায় কিছু পরিবর্তন এসেছে। পনেরো বছর আগে এই শিল্পে কর্মীসংখ্যা ছিল অনেক কম, এবং তাদের সাধারণত নিয়োগ করা হত ভারতের সেরা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজগুলি থেকে, যাদের মেধা ইতিমধ্যেই প্রতিষ্ঠিত বলেই তারা সেখানে পড়ার সুযোগ পেয়েছে। কিন্তু তারপর তথ্যপ্রযুক্তির কাজের পরিমাণ এবং সেহেতু কর্মীনিয়োগ বিপুলভাবে বাড়তে থাকে কয়েক বছর ধরে। এই প্রয়োজনের ভগ্নাংশও বড়ো ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজগুলি থেকে পাওয়া সম্ভব ছিল না। তাই পাল্লা দিয়ে তৈরি হয় নতুন নতুন বেসরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ। এবং তথ্যপ্রযুক্তির নিয়োগ আর বড়ো ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজগুলির মধ্যে সীমিত থাকে না, তা ছড়িয়ে পরে বেসরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ও সরকারি কলেজের বিজ্ঞানের স্নাতকদের মধ্যেও। এটা সম্ভব হয় এই কারণে যে এই কাজের বেশিরভাগের যে দক্ষতা প্রয়োজন সেটা হচ্ছে এই কাজের অর্থাৎ প্রোগ্রাম লেখার জন্য উপযুক্ত বুদ্ধি বা মেধা (aptitude) ও কিছু বিজ্ঞানের পড়াশোনা। এগুলো থাকলে বাকিটা শিখে নেওয়া সম্ভব।

যদিও এটা কখনোই বলা যায় না যে তথাকথিত ভালো কলেজের ছাত্র মানেই বেশি মেধাবী হবে বা কর্মজীবনে বেশি দক্ষতা দেখাবে, কিন্তু আগে যে কর্মীনিয়োগ সীমিত ছিল সেরা কলেজগুলির সেরা বিভাগগুলির মধ্যে, তা যখন প্রসারিত হয়ে প্রায় একটি গণনিয়োগে দাঁড়াল, তখন নিয়োগপদ্ধতির মধ্যেই সাধারণভাবে মেধার যে বাছাই প্রক্রিয়া অন্তর্নিহিত ছিল, তা অনেকাংশে কমে গেল এবং কর্মীদের মধ্যে মেধার উচ্চাবচ অনেক বেড়ে গেল। এ ছাড়াও কর্মীসংখ্যা বেড়ে গেল বহুগুণ। তার ওপর দ্রুত বদলে যাচ্ছে প্রযুক্তিরাশি, এক একটি প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ কয়েক বছরের মধ্যে পুরোনো হয়ে গিয়ে আসছে নতুন ল্যাঙ্গুয়েজ, কাজের পদ্ধতিতেও আসছে পরিবর্তন; এই সদাপরিবর্তনশীল প্রযুক্তির দুনিয়ায় কর্মীদের সবসময় তাল মিলিয়ে চলতে হচ্ছে। সবাই যে একইভাবে সেটা করতে সক্ষম তা নয়। তার ওপর ক্রমবর্ধমান গ্রাহকদের চাহিদা, তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পুরোনো কর্মীদের পক্ষে শিখে করার হয়তো সময় থাকছে না, সেই জায়গায় আসছে নতুন কর্মীরা। সব মিলিয়ে গত কয়েক বছরে কর্মীদের পরিহার্যতাও বৃদ্ধি পেয়েছে। এর ফলে কর্মী-ছাঁটাইয়ের ঘটনাও, অন্যান্য অনেক ক্ষেত্রের তুলনায় অনেক কম হলেও, মাঝে মাঝেই শোনা যাচ্ছে। যার ফলস্বরূপ তৈরি হয়েছে তথ্যপ্রযুক্তি কর্মীদের ক্ষোভ-দাবিদাওয়া নিয়ে বলার জন্য কিছু ইউনিয়নও। কিন্তু সাধারণভাবে মানসিকভাবে তথ্যপ্রযুক্তির কোম্পানি ও কর্মীরা সবাই দ্রুত পরিবর্তনের জন্য প্রস্তুত থাকে, এই শিল্পের গভীরে এই মানসিকতা নিহিত আছে। সব মিলিয়ে আগামী কয়েক বছরে এই শিল্পে বিভিন্ন দিক থেকে কতটা পরিবর্তন আসে সেটা লক্ষ করার।

কর্ম সংস্কৃতি

কর্মসংস্কৃতির দিক থেকে তথ্যপ্রযুক্তি একটু আলাদা। এখানে মূলত দুরকম কাজ হয়, একটা নতুন সফ্‌টওয়্যার তৈরির কাজ আর দ্বিতীয়টি যে সফটওয়্যার চলছে তার রক্ষণাবেক্ষণের কাজ। এ ছাড়াও আছে ব্যাবসা বাড়ানোর জন্য নতুন সম্ভাব্য ক্রেতাদের কাছে নতুন কাজের প্রস্তাব নিয়ে পৌঁছনো। এ ছাড়া যে-কোনো একটি কোম্পানি চালানোর জন্য যে কাজগুলি লাগে সেগুলি তো আছেই। এই যে মূল দুরকমের কাজ, এর মধ্যে রক্ষণাবেক্ষণের কাজটি বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই চব্বিশ ঘন্টাই চলতে থাকে, কারণ এই ই-কমার্সের যুগে দোকান বন্ধ হলেও, ওয়েবসাইটের মাধ্যমে ব্যাবসা সদাজাগ্রত থাকে। এই রক্ষণাবেক্ষণের দলগুলি বেশিরভাগ সময়েই কাজ করে শিফ্‌টে, কখনো অফিসে উপস্থিত থেকে, কখনো-বা বাড়ি থেকে, ইন্টারনেট ও অফিসের কম্পিউটারের সাহায্যে। সাধারণভাবে এদের কাজের সময় নির্দিষ্ট থাকে। কিন্তু যদি কোনো কারণে কোনো গণ্ডগোল হয় যার ফলে একটি সফ্‌টওয়্যার ঠিক করে কাজ করা বন্ধ করে দেয়, তা হলে সেটিকে ঠিক করে পুনরায় চালু করার জন্য এই দলের লোকদের অনেক সময়েই সাধারণ অফিসের সময়ের বাইরে অনেকক্ষণ কাজ করতে হয়, কখনো টানা রাতদিনও করতে হয়।

আর নতুন সফ্‌টওয়্যার তৈরির কাজ যারা করে, তাদের খেয়াল রাখতে হয় কাজটি (বা কাজের একটি নির্দিষ্ট পর্যায়) শেষ করার যে দিনটি গ্রাহকের কাছে কথা দেওয়া আছে, সেটির দিকে। প্রতিদিনের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে এদের কাজ হয় না। তাই অনেক সময়েই দেখা যায় কোনো কারণে কাজটি একটা অংশে বিলম্বিত হলে, সেই হারানো সময়কে উদ্ধার করার জন্য একটা প্রজেক্টের দল দিনরাত এক করে কাজ করছে। এক্ষেত্রে এটাও মনে রাখা দরকার যে ভারতীয় তথ্যপ্রযুক্তির ক্রেতা বা গ্রাহকরা মূলত উন্নত বিশ্বের দেশগুলি হওয়ায় একদিকে যেমন এই শিল্পের আয় তুলনামূলকভাবে বেশি, সেরকমই তাদের

কর্মসংস্কৃতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে হয়। এবং সেই কর্মসংস্কৃতির একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে দেওয়া কথা বা দিন-কে রাখা। বিশেষ করে একটি ভারতীয় কোম্পানিকে যখন কাজ করার জন্য পয়সা দিচ্ছি, তখন সেটা কড়ায় গন্ডায় বুঝে নেওয়ার একটা মানসিকতা হামেশাই দেখা যায়। অনেক সময়েই চুক্তিপত্রে একইসঙ্গে কাজে দেরি হওয়ার জন্য এবং ঠিকঠাক গুণমান না হওয়ার জন্য অনেক টাকা ক্ষতিপূরণ ধরা থাকে, যেগুলি থেকে বাঁচার জন্য প্রচুর পরিশ্রম করতে হয়। আবার কোনো কোনো সময় কাজের গতি থাকে তুলনামূলকভাবে কম, সেই সঙ্গে কাজের চাপও।

সব মিলিয়ে সম্পূর্ণ আন্তর্জাতিক বাজারের ক্ষুরধার প্রতিযোগিতামূলক দামে উচ্চ গুণমানের পণ্য তৈরি করে যেতে হয়, যে পণ্য তৈরির ক্ষেত্রে প্রধান উপাদান মানুষের মেধা, যাকে যন্ত্রের মতো চালানো মুশকিল, কিন্তু শেষপর্যন্ত প্রতিশ্রুতি মতো একটা দিনের মধ্যে শেষ করতে হবে। সুতরাং এই শিল্পের দিনের কাজের মূল চালিকাশক্তি কাজের অগ্রগতি, ঘড়ির কাঁটা এখানে কম গুরুত্বপূর্ণ।

বিশ্বের জানালা হিসেবে তথ্যপ্রযুক্তি

তিন-চার দশক আগে বিদেশে, পাশ্চাত্যের তথাকথিত উন্নত বিশ্বে, দুরকমের ভারতীয় দেখা যেত। এক, যাঁরা বহু কষ্ট করে, কখনো আইনি কখনো বেআইনি পথে বিদেশে গিয়েছেন এবং সেখানে সস্তায় কায়িক শ্রম করেন এবং সেই সামান্য আয় থেকেই যথাসম্ভব সঞ্চয় করে কিছুটা দেশে পাঠান এবং বাকিটা দিয়ে পায়ের তলার জমি একটু শক্ত করার চেষ্টা করেন পরবর্তী প্রজন্ম ভালো থাকবে এই আশায়। দ্বিতীয় দলে আছেন যাঁরা অত্যন্ত মেধাবী এবং/অথবা অতি বিত্তবান ঘরের সন্তান (প্রধানত ছেলে), যাঁরা অসাধারণ মেধার জোরে এবং/অথবা পারিবারিক বিত্তের সহায়তায় বিদেশে পড়তে গেছেন— ডাক্তারি ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যারিস্টারি বা বিজ্ঞান বা কলার যে-কোনো বিষয়। এঁরা সুযোগ-সুবিধার দিক থেকে সাধারণত দেশের এলিট শ্রেণি থেকে আসতেন এবং বেশিরভাগ সময়েই বিদেশেই স্থায়ীভাবে বসবাস করে সুনাম এবং গৌরবের সঙ্গে নিজের কাজ করতেন। আবার কেউ কেউ, মূলত ডাক্তার বা ব্যারিস্টার, দেশে এসে নিজের পেশায় সুপ্রতিষ্ঠিত হতেন। এর বাইরেও নিশ্চয়ই অনেকে বিদেশে গেছেন, কিন্তু আমি মূল ধারা দুটির কথা বললাম।

এর মধ্যে দিয়ে দুটো জিনিস দেখা যাচ্ছে। প্রথমত, সাধারণ ছাপোষা মধ্যবিত্ত বা নিম্নবিত্ত পরিবারের সন্তান, যারা মেধাবী কিন্তু হয়তো অসাধারণ কিছু নয়, এদের পাশ্চাত্য দুনিয়ার সঙ্গে সরাসরি কোনো যোগাযোগ ছিল না। এবং দ্বিতীয়ত, বিদেশযাত্রীদের বেশিরভাগই বিদেশে থেকে যেতেন; যাঁরা ফিরতেন তাঁরা ঠিক সাধারণের ধরাছোঁয়ার মধ্যে নন। সব মিলিয়ে পাশ্চাত্য দুনিয়া সাধারণ ভারতীয়র কাছে এক গল্পে শোনা না-দেখা জগৎ ছিল তার বহুবিধ মিথ-সহযোগে।

গত তিন দশকে কিন্তু তথ্যপ্রযুক্তির হাত ধরে ভারতীয়দের আরেকটা বড়ো অংশের সঙ্গে পাশ্চাত্য দুনিয়ার সরাসরি যোগাযোগ ঘটল। অনেক সাধারণ মধ্যবিত্ত এবং অনেক ক্ষেত্রে নিম্নবিত্ত পরিবারের মেধাবী ছেলেমেয়েরা ভারতের বিভিন্ন ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে পাশ করে তথ্যপ্রযুক্তিতে চাকরি পেল এবং কিছুদিনের মধ্যে বিভিন্ন প্রজেক্টের কাজ করার জন্য পাশ্চাত্যের বিভিন্ন শহরে পাড়ি জমাল।

এদের এই বিদেশযাত্রা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কিছুদিনের জন্য, কয়েক মাস থেকে এক-দেড়-দুই বছর, আজীবনের নয়। বিদেশে থাকাকালীন এদের সেখানে একটা জীবন তৈরি করতে হয়, বিদেশের মধ্যবিত্ত জীবন— ভাড়াবাড়ি, বাসে-ট্রেনে অফিস যাতায়াত, বাজার-রান্না, কখনো সখনো ছুটিতে দল বেঁধে বেড়াতে যাওয়া। প্রথম প্রথম এরা নিজেদের মধ্যে অর্থাৎ ভারতীয়দের মধ্যে, সম্ভব হলে নিজের প্রদেশের লোকেদের মধ্যে যথাসম্ভব গা-ঘেঁষাঘেঁষি করে থাকার এবং পাশ্চাত্য জীবনকে যথাসম্ভব এড়িয়ে চলার চেষ্টা করে। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে সেই সব দেশের মানুষজন সংস্কৃতির আঁচ এদের গায়েও পড়ে। তাদের ঋতুচক্র, উৎসব, মিউজিয়াম, খেলাধুলো, রাজনীতি, গান-বাজনা, শুক্রবার সন্ধেবেলা পাবে আড্ডা, ইত্যাদির সঙ্গে সে পরিচিত হয়, এবং অনেক ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ করে। এ ছাড়াও তার সম্যক অভিজ্ঞতা হয় পাশ্চাত্য কর্মসংস্কৃতির। কিছু কিছু বিদেশির সঙ্গে তাদের বন্ধুত্ব হয়, এবং প্রতিদিনের জীবনযাপন, কথাবার্তা, আড্ডার মধ্যে দিয়ে দুপক্ষেরই অপর পক্ষ সম্পর্কে অনেক কিছু জানা হয় এবং সাধারণভাবে দুপক্ষই বুঝতে পারে যে তাদের ভাষা, সংস্কৃতি, লোকাচার, উৎসব অনেক আলাদা হলেও মানুষ হিসেবে তাদের মধ্যে মিলই বেশি এবং পরস্পরের সম্পর্কে না-জানা বা কম-জানা থেকে তৈরি হওয়া বেড়া নিজেদের অজান্তেই ভেঙে যায়। এরপর কাজ শেষ করে এই ভারতীয় ছেলে বা মেয়েটি একসময় নিজের দেশে ফিরে আসে এবং বিদেশ সম্পর্কে তার গল্প তার গ্রামে বা পাড়ায়, বেহালা-যাদবপুর থেকে বাঁকুড়ার পলাশবনি বা জলপাইগুড়ির বানারহাট, তার আত্মীয়-প্রতিবেশী-বন্ধুদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে, তাদের কাছেও অনেক বেশি পরিচিত হয়ে ওঠে পাশ্চাত্য দুনিয়া।

এই ব্যাপারটা শুধু তথ্যপ্রযুক্তি নয়, অন্যান্য ক্ষেত্রেও গত কুড়ি বছরে কিছু কিছু হয়েছে, কিন্তু তথ্যপ্রযুক্তিতে হয়েছে অনেক বেশি। এবং কাজের এই বিশেষ প্রয়োজনটির জন্য, যেখানে একজন কর্মী বেশ কয়েক মাস বিদেশে কাটিয়ে আবার দেশে ফিরে আসেন, তথ্যপ্রযুক্তি নিজের অজান্তেই প্রাচ্য ও

পাশ্চাত্যের মধ্যে এক অভিনব সেতুবন্ধন করেছে। এই লেনদেন এখনও প্রধানত ওরাল ট্র্যাডিশনেই সীমাবদ্ধ, কিন্তু এইসব কাহিনি কোনো যোগ্য ব্যক্তির হাতে অচিরেই লিপিবদ্ধ হবে, এই আশাও হয়তো আমরা করতে পারি।

---

১. https://economictimes.indiatimes.com/tech/ites/how-the-indian-it-services-sector-is-seeking-to-make-its-biggest-transformation/articleshow/60502487.cms. ET– 14-sep-2017 Vertually

২. এক্ষেত্রে আরেকটা কথা মনে রাখা দরকার— বারবার একই নিয়মে হয়ে চলা কাজ কম্পিউটার মানুষের থেকে অনেক দ্রুত করতে পারলেও মানুষের ইচ্ছা বা আবেগ থেকে নেওয়া সিদ্ধান্ত যা অবচেতনে হওয়া বহু কারণের সম্মিলিত ফলাফল, এ-জিনিস কম্পিউটার করতে পারে না। এক্ষেত্রে প্রাক্তন বিশ্ব-চ্যাম্পিয়ন দাবাড়ু গ্যারি কাসপারভের একটি বক্তব্য মনে রাখা যায়। কাসপারভ বলেছিলেন মানুষ যা যা করে এবং জানে যে সে সেটা কীভাবে করছে, সেরকম কাজ কোনো না কোনো সময় কম্পিউটার করতে পারবে।

৩. https://www.cse.iitk.ac.in/pages/AboutTheDepartment.html

৪. কোম্পানি হিসেবে উইপ্রো শুরু হয় ১৯৪৫ সালে, কিন্তু তখন তাদের ব্যাবসা ছিল আলাদা। ১৯৮০ সালে উইপ্রো তথ্যপ্রযুক্তিতে আসে।

৫. http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=162046

ছবি : তিতির বন্দ্যোপাধ্যায়

বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে

অম্বিকেশ মহাপাত্র

২৪ মার্চ ২০১৫ দেশের শীর্ষ আদালত সুপ্রিম কোর্টের ঐতিহাসিক রায় ঘোষণা। দেশের সংবিধান বিরোধী এবং স্বাধীন মতপ্রকাশের অধিকার বিরোধী Information Technology (IT) Act-এর section 66A অর্থাৎ তথ্য প্রযুক্তি আইনের 66A ধারা বাতিল। হঠাৎ? না।

IT Act-এর 66A ধারাটি ২০০৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে চালু হয়। তারপর থেকেই রাজ্যে রাজ্যে এই ধারার অপপ্রয়োগ হয়ে আসছিল। সাধারণ মানুষের স্বাধীন মতপ্রকাশের মৌলিক অধিকারের উপর এই ধারা প্রয়োগের মাধ্যমে নানান আক্রমণ বারে বারে হয়েই আসছিল। কোনো বক্তব্য বা মত বা মতামত বা মন্তব্য বা মিম বা ছবি বা কার্টুন বা কোলাজ বা অন্যকিছু, বিশেষ করে যা শাসকদল বা মৌলবাদীদের অপছন্দ হলেই আক্রমণ। শারীরিক নিগ্রহ, পুলিশ দিয়ে গ্রেফতার, ফৌজদারি মামলা দায়ের সবকিছুই চলছিল।

১৭ নভেম্বর ২০১২ শিবসেনা প্রধান বালাসাহেব থ্যাকারের শেষকৃত্যে মুম্বাই শহর কার্যত বন্ধের চেহারা নিয়েছিল, অচল হয়ে গিয়েছিল। এই ঘটনার প্রেক্ষিতে মুম্বাই শহরের পার্শ্ববর্তী থানে জেলার পালঘড় থানা এলাকার কলেজ-ছাত্রী শাহীন ধাদা ফেসবুকে একটি মন্তব্য (comment) করেন। তাঁরই বন্ধু কলেজ ছাত্রী রিণু শ্রীনিবাসন মন্তব্যটিকে সমর্থন (like) করেন। শিবসেনা দলের অনুগামীরা ক্রুদ্ধ হয়ে দলবদ্ধভাবে শাহীন ধাদার কাকার নার্সিং হোমে ঢুকে ভাঙচুর করে। এবং কলেজ-ছাত্রী শাহীন ধাদা এবং রিণু শ্রীনিবাসন, দুজনের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করে। ফলশ্রুতিতে IT Act-এর 66A ধারায় পুলিশ দুজনকেই গ্রেফতার করেন এবং ফৌজদারি মামলা দায়ের করেন। স্বাধীন মতপ্রকাশের অধিকারের উপর বে-আবরু আক্রমণের বিরুদ্ধে, প্রতিবাদে মানুষ দেশজুড়ে সোচ্চার হন। রাজ্য সরকারের টনক নড়ে। মহারাষ্ট্র সরকার স্থানীয় পুলিশ সুপারকে দিয়ে তদন্ত শুরু করেন। দ্রুত তদন্ত শেষে রাজ্য সরকার দোষী পুলিশ অফিসারদের সাসপেন্ড করেন এবং মামলা প্রত্যাহার করে নিয়ে চ্যাপ্টার ক্লোজ ঘোষণা করেন। শাহীন ধাদা, রিণু শ্রীবাসন, তাঁদের পরিবার-পরিজন সহ সকল শুভবুদ্ধিসম্পন্ন ও গণতান্ত্রিক মানুষ স্বস্তি পান।

শাহীন ধাদা ও রিণু শ্রীবাসনের গ্রেফতার এবং IT Act-এর 66A ধারা বারবার অপপ্রয়োগের বিরুদ্ধে দিল্লিবাসী আইন কলেজের ছাত্রী শ্রেয়া সিঙ্ঘাল উদ্বিগ্ন হন। ফলশ্রুতিতে ২৯ নভেম্বর ২০১২ দেশের শীর্ষ আদালত সুপ্রিম কোর্টে IT Act-এর 66A ধারা বাতিলের দাবি জানিয়ে জনস্বার্থ মামলা দায়ের করেন। দীর্ঘ প্রায় দুবছর চার মাস শুনানি শেষে ২৪ মার্চ ২০১৫ দেশের শীর্ষ আদালত চূড়ান্ত রায়ে IT Act-এর 66A ধারা বাতিলের ঘোষণা করেন। শুভবুদ্ধিসম্পন্ন ও গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষ স্বস্তিবোধ করেন। স্বস্তিবোধের কারণ? IT Act-এর 66A ধারায় চলা ফৌজদারি মামলাগুলি সরকার পক্ষ তুলে নেবেন নতুবা সংশ্লিষ্ট আদালতের মাননীয় বিচারপতি স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে দেশের আইন রক্ষার্থে মামলাগুলি খারিজ করবেন। স্বাধীন মতপ্রকাশের মৌলিক অধিকার পুনরুদ্ধার হবে এবং পরবর্তী সময়ে IT Act-এর 66A ধারার অপপ্রয়োগে স্বাধীন মতপ্রকাশের অধিকার, মৌলিক অধিকার আর আক্রান্ত হবে না।

এই পর্যন্ত সব ঠিক ছিল। কিন্তু আমার অভিজ্ঞতা অন্য কথা বলছে। আমি একটি নিরীহ অথচ বুদ্ধিদীপ্ত কোলাজ কার্টুন ই-মেলে বন্ধুদের ফরোয়ার্ড করেছিলাম। কোলাজ কার্টুনটিতে মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী সহ শাসকদলের সমালোচনা ছিল। সে কারণে শাসকদলের অনুগামী দুষ্কৃতকারীরা পুলিশের যোগসাজশে, ১২ এপ্রিল ২০১২ পরিকল্পনা-মাফিক আমাদের আবাসনে জড়ো হয়েছিল। রাত্রিবেলা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাড়ি ফেরার পথে আমাকে শারীরিকভাবে নিগ্রহ করেছিল। প্রাণনাশের হুমকি দিয়েছিল। পরে পুলিশ ডেকে আমার সঙ্গে সত্তরোর্ধ্ব সুব্রত সেনগুপ্তকে গ্রেফতার করিয়ে পূর্ব যাদবপুর থানার লক-আপে আটকে রাখার ব্যবস্থা করেছিল। ফলে কলকাতা মহানগরের আলিপুর আদালতে ফৌজদারি মামলা দায়ের করা হয়েছিল। পরে কলকাতা পুলিশ ১৯ জুলাই ২০১২ আদালতে IT Act-এর 66A ধারায় চার্জশিট দাখিল করেছিলেন। শীর্ষ আদালতে

সুপ্রিম কোর্টের ঐতিহাসিক রায়ের পর ৪ বছর ৯ মাস অতিক্রান্ত। আমার এবং সুব্রত সেনগুপ্ত (এখন প্রয়াত)-এর উপর দায়ের করা আলিপুর আদালতে চলা ফৌজদারি মামলার কী অবস্থা?

যেহেতু পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য সরকার দেশের শীর্ষ আদালতের রায়কে স্বাগত জানাননি, সেহেতু রাজ্য সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে মামলা প্রত্যাহারও করেনি। অপরপক্ষে রাজ্য সরকার মামলা চালু রাখার জন্য নানান কৌশল গ্রহণ করে চলেছেন। শীর্ষ আদালতের রায়ের প্রেক্ষিতে আলিপুর আদালত স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে দেশের আইন রক্ষার্থে মামলা খারিজও করেননি। শীর্ষ আদালতের এই রায়ের প্রেক্ষিতে আমাদের দায়ের করা 'মামলা বাতিলের আবেদন'-এরও নিষ্পত্তি হয়নি। ফলশ্রুতিতে ১৩ এপ্রিল ২০১২ আলিপুর আদালতে দায়ের করা ফৌজদারি মামলা, ১৯ জুলাই ২০১২ IT Act-এর 66A ধারায় দাখিল করা চার্জশিট এবং ১ জুন ২০১৩ আদালত চার্জশিট চূড়ান্তরূপে গ্রহণ করার পর আজও মামলা চলছে। ইতিমধ্যে ১১ মে ২০১৯ এই ফৌজদারি মামলায় আমার সহ-অভিযুক্ত মাননীয় সুব্রত সেনগুপ্ত প্রয়াত হয়েছেন। আমার বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা থাকার কারণে কলকাতা রিজিওনাল পাসপোর্ট অফিস আমার ভারতীয় পাসপোর্ট পুনর্নবীকরণ আটকে দিয়েছেন। তার সঙ্গে অন্য সকল রকমের হেনস্থা-হয়রানি চলছে। এটা ঠিকই ২৪ মার্চ ২০১৫ দেশের শীর্ষ আদালত IT Act-এর 66A ধারা বাতিল করেছেন। তারপর প্রায় ৪ বছর ৯ মাস অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। কিন্তু ওই ধারায় ফৌজদারি মামলা এখনও নিম্ন আদালতে চলছে। আইন অনুযায়ী কেউই কিচ্ছু করতে পারছেন না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস সম্ভবত কেউই কিছু করতে পারবেন না। কারণ রাজ্যের সরকার মামলার নিষ্পত্তি চাইছেন না। বিচার-ব্যবস্থা থাকুক, বিচার-ব্যবস্থার উপর সাধারণ মানুষের আস্থা থাকুক। কিন্তু, আমি আস্থা রাখি কী করে?

এখানে বিচার-ব্যবস্থা সম্পর্কে দু-একটি প্রসঙ্গ উল্লেখ করা যেতে পারে। আমার কথা নয়। বহুল প্রচলিত সাধারণ মানুষের কথা। 'বিচার-ব্যবস্থা দীর্ঘসূত্রি ব্যবস্থা' এবং 'Justice Delayed, Justice Denied'। মাননীয় সুব্রত সেনগুপ্ত মহাশয়ের ক্ষেত্রে তা প্রমাণিত। বিচার ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রকৃত অপরাধী এবং খুনিকে বাঁচাতে আইনজীবী খুনির পক্ষ নেন এবং জোর সওয়ালও করেন। সফল হলে, তিনি শ্রেষ্ঠ এবং দুঁদে আইনজীবী হিসেবে স্বীকৃত হন। আমাদের রাজ্যের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী একদা প্রকাশ্যে জানিয়েছিলেন— বিচার কেনা যায়। সত্যি কেনা যায় কি না জানি না। তবে রাজ্য সরকার চাইলে বিচার-ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করতে পারেন, সেটা আমার উপর চলা ফৌজদারি মামলা তারই সাক্ষ্যপ্রমাণ।

অভিযুক্ত বিদ্যাসাগর: প্রসঙ্গ বিবেকানন্দ

শ্যামাপ্রসাদ বসু

১৮৫৬ সালের ২৬ জুলাই বিদ্যাসাগরের উদ্যোগে বিধবা-বিবাহ আইন পাশ হওয়ার পর থেকে বিদ্যাসাগর নিজেকে ব্যস্ত রেখেছিলেন হয় স্কুল-কলেজ পরিচালনায় (মেট্রোপলিটান ইনস্টিটিউশন ও কলেজ), নতুবা বিধবাদের বিবাহের জন্য কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণে। কৌতূহলের বিষয় বিবেকানন্দ এটিকে খুব বড়ো কোনো কাজ বলে মনে করেননি। তাঁর বক্তব্য ছিল বিধবারা বিয়ে করবে কি না সেটা তারাই ঠিক করবে। 'বিধবা-বিবাহ আন্দোলনে শতকরা সত্তর জন নারীর কোনো স্বার্থ নেই।' (বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ; শংকরীপ্রসাদ বসু, তৃতীয় খণ্ড; পৃ. ২৬২, কলকাতা, ১৯৮০) গিরিজাশংকর রায়চৌধুরী এর একটা উত্তর দিয়েছিলেন, ''স্বামীজীর কথার ভাব এই রূপ যে 'বিধবারা' বিবাহ করিবে কিনা তাহা বিধবারাই জানে। আমরা বিধবা নই।'' (স্বামী বিবেকানন্দ ও সংস্কার ঊনবিংশ শতাব্দী; পৃ. ২৫৩; উদ্বোধন, ১৩৩৪)

শতকরা সত্তর জনের স্বার্থ নেই বলে কেবল উচ্চবর্ণের মধ্যে সমাজ সংস্কারের আন্দোলনকে বিরাট কোনো কাজ নয় আখ্যা দিলে তা হবে সমস্যার অতি সরলীকরণ। বিশেষ করে যখন আমরা জানি এই উচ্চশিক্ষিত উচ্চবর্ণের মানুষদেরই একাংশ ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনে অগ্রদূতের ভূমিকা নিয়েছিলেন। সামাজিক সংস্কারের মাধ্যমে ব্রাহ্মণ বিদ্যাসাগর সেই অগ্রদূতের ভূমিকাই নিয়েছিলেন। তিনি প্রথমেই টার্গেট করেছিলেন তাঁর সমাজ ও শ্রেণিকে। এটিকে কোনোভাবেই হালকা করে দেখা যায় না— মন্তব্য তো দূরের কথা!

শংকরীপ্রসাদ বসু উপরিউক্ত গ্রন্থে বিধবাবিবাহ বিষয়ে বিবেকানন্দের দৃষ্টিভঙ্গির দীর্ঘ আলোচনা করেও স্বীকার করেছেন তাঁর এ বিষয়ে 'অধিক উৎসাহে'-র কথা। তথাকথিত কিছু নিম্নশ্রেণির বা বর্ণের মধ্যে বিধবাবিবাহ প্রচলিত— একথা নিশ্চয় পরিব্রাজক বিবেকানন্দের অজ্ঞাত ছিল না। তিনি একথাও জানতেন উচ্চবর্ণের 'বাবু' সমাজের দাপটে তা ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছিল। সমাজবিজ্ঞানীরা বলেন সংস্কৃতি ও রীতিনীতির ক্ষেত্রে সমাজের নিচু ধাপের লোকেরা উপরের ধাপকেই অনুসরণ করে।

বিবেকানন্দ অবশ্য বিদ্যাসাগরের বিরাট সামাজিক প্রভাব সম্পর্কে খুবই সচেতন ছিলেন। আলমোড়ায় সিস্টার নিবেদিতার কাছে কথাপ্রসঙ্গে বলেছিলেন, 'উত্তর ভারতে আমার বয়েসি এমন কোনো লোক ছিল না, যার উপর তাঁর ছায়া পড়েনি।'

আসলে বিবেকানন্দ ক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন বিদ্যাসাগর ঈশ্বরকে 'বোধোদয়' গ্রন্থে 'নিরাকার, চৈতন্যস্বরূপ' বর্ণনা করায়। বাল্যবন্ধু প্রিয়নাথ সিংহের লেখা 'স্বামীজীর স্মৃতি' থেকে জানা যায় একদিন বিবেকানন্দ শিশুদের উপযোগী কোনো পাঠ্যপুস্তক না থাকার জন্য আক্ষেপ করলে উপস্থিত একজন তাঁকে বিদ্যাসাগরের লেখা শিশু পুস্তকগুলির কথা মনে করিয়ে দেন। তা শুনে তিনি উচ্চস্বরে হেসে ওঠেন এবং বলেন, 'ঈশ্বর নিরাকার, চৈতন্যস্বরূপ', 'গোপাল অতি সুবোধ বালক' ... 'ওতে কোনো কাজ হবে না...' (স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, নবম খণ্ড; পৃ. ৪০৫, উদ্বোধন, ১৯৭৩)

কথাপ্রসঙ্গে শ্রী'ম' (মাস্টারমশায়) একবার স্বামীজির কাছে বলেন, ('কথামৃত' দ্বিতীয় খণ্ড; প্রথম পরিচ্ছেদ) ''বিদ্যাসাগর বলেন, 'আমি নিজে ঈশ্বরের বিষয় কিছু বুঝি না, আবার পরকে কি লেকচার দেব?' ''

নরেন্দ্র— 'যে এটা বোঝে নাই, সে দয়া, পরোপকার বুঝলে কেমন করে?'

মাস্টার— 'আর পাঁচটা কি?'

নরেন্দ্র— 'স্কুল বুঝলে কেমন করে? স্কুল করে ছেলেদের বিদ্যা শিখাতে হবে, আর সংসারে প্রবেশ করে, বিয়ে করে, ছেলেমেয়েদের বাবা হওয়াই ঠিক, এটাই বা বুঝলে কেমন করে? যে এটা ঠিক বোঝে সে সব বোঝে।'

আসলে ঈশ্বর সম্পর্কে বিদ্যাসাগরের এক ধরনের অনীহা বিবেকানন্দকে খুশি করতে পারেনি। বস্তুত বিদ্যাসাগরের বিষয়ে বিবেকানন্দের মনোভাব কিছুটা মোনালিসার হাসির মতো, কারণ নিবেদিতার কাছে বিদ্যাসাগরের যে মূল্যায়ন করেছিলেন, তা ছিল তাঁর একেবারে নিজস্ব, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা-প্রসূত সঠিক। সত্যই উত্তর ভারতে তাঁর বয়সি যুবাদের উপর

বিদ্যাসাগরের অসাধারণ প্রভাব। কিন্তু মনে রাখতে হবে এটি ছিল তাঁর সাধারণভাবে বস্তুগত বিচার। তিনি নিজে কতটা প্রভাবিত হয়েছিলেন সে বিষয়ে স্পষ্ট করে কিছু বলেননি। এমনকী এর সপক্ষে কোনো ঘটনারও উল্লেখ করেননি।

বরং বিদ্যাসাগরকে জড়িয়ে মাঝেমধ্যে বিবেকানন্দ যেসব মন্তব্য করেছেন তা খুবই অস্বস্তিকর। দু-একটি মন্তব্যের কথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। যথা, বিধবা-বিবাহ এবং শিশুপাঠ্য সম্পর্কে। এ ছাড়া মেট্রোপলিটান ইনস্টিটিউশনের শ্যামবাজার শাখার প্রধানশিক্ষক শ্রী'ম' (মাস্টারমশায়/ মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত) সংক্রান্ত ঘটনাটিতে তাঁর অযাচিত মন্তব্য আদৌ বিদ্যাসাগরের সম্মান বৃদ্ধি করে না।

১৮৮৬ সালের ২০ শ্রী'ম'-র জীবনে ঘনিয়ে এসেছিল দারুণ এক দুঃসময়। সেবছর বিদ্যালয়ের পরীক্ষার ফল আশানুরূপ হয়নি। বিদ্যাসাগর এই মন্দ ফলাফলের জন্য প্রধানশিক্ষক শ্রী'ম' তথা মাস্টারমশায়কে দায়ী করলেন। কারণ হিসেবে জানালেন, শ্রীরামকৃষ্ণর কাছে ঘনঘন যাতায়াত এবং তার ফলে বিদ্যালয়ের কাজে গাফিলতি। যদিও একথা সত্য মাস্টারমশায় সাধারণভাবে রবিবার অথবা ছুটির দিনগুলিতে রামকৃষ্ণের সাক্ষাতে যেতেন কিন্তু একইভাবে একথাও সত্য সব সময়ে এ ধরনের রুটিন তিনি মেনে চলতে পারেননি। অনেক সময়েই দেখা গেছে অসুস্থ রামকৃষ্ণকে সময় দিতে গিয়ে অথবা রামকৃষ্ণের কোনো আনন্দের শরিক হতে গিয়ে বিদ্যালয়ে নির্দিষ্ট সময়ে হাজিরা দিতে পারেননি। দু-একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। ১৮৮২ সালের ১৫ নভেম্বর গড়ের মাঠে রামকৃষ্ণের সঙ্গে সার্কাস দেখতে গিয়ে দুপুর তিনটের সময়ে বিদ্যালয় পরিত্যাগ করেছিলেন। সাধারণভাবে স্কুল শুরু হত সকাল সাড়ে দশটার সময়ে। কিন্তু তাঁকে প্রায়ই দেখা যেত তিনি বেলা দশটার সময়েও রামকৃষ্ণের দর্শনপ্রার্থীদের মধ্যে হাজির। আবার ২৯ অক্টোবর (১৮৮৫) বৃহস্পতিবার তাঁকে দেখা যাচ্ছে ডা. মহেন্দ্রলাল সরকারের কাছে সকালবেলা রামকৃষ্ণের অসুখের রিপোর্ট নিয়ে যেতে। ডাক্তার তাঁকে পরামর্শ দিলেন, রামকৃষ্ণের কাছে থাকতে। উত্তর কলকাতার বিভিন্ন রোগী দেখার পর 'মাস্টারমশায়কে নিয়ে সবশেষে ডা. সরকার গেলেন রামকৃষ্ণকে দেখতে।' 'কথামৃত'-তে কোথাও উল্লেখ নেই তিনি উক্ত দিনে স্কুল থেকে ছুটি নিয়েছিলেন অথবা দেরিতে স্কুলে গিয়েছিলেন। (দ্বিতীয় ভাগ; পৃ. ২১৬-২১৭; ১৩৮৮)

যাইহোক, বিদ্যাসাগরের অভিযোগ শ্রী'ম'-র কাছে খুবই অপমানজনক মনে হয়েছিল এবং তিনি দীর্ঘ সময় ধরে চিন্তা করে শেষ পর্যন্ত চাকরি থেকে ইস্তফা দিলেন।

তখন কাশীপুর উদ্যানে শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন। শ্রী'ম' তাঁকে ইস্তফার কথা জানালে তিনি শুধু বললেন, 'বেশ করেছ'। ওই ঘটনার তিন দিন পরে (২৩ মে, ১৮৮৬) নরেন্দ্রনাথ যখন সমস্ত ঘটনা জানতে পারলেন, তখন তিনি প্রচণ্ড রেগে গেলেন। শ্রী'ম' অবশ্য নিজের থেকে কিছু বলেননি। সেদিন অন্যান্য দিনের মতো শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখতে এসে নরেন্দ্রনাথ, শ্রী'ম', ছোটো নরেন প্রমুখ অনেক ভক্ত কাশীপুর উদ্যানের দালান-ঘরে বসে নানা বিষয়ে আলোচনা করছিলেন, এমন সময় গদাধর নামে এক ভক্ত মাস্টারমশায়ের সামনে নরেন্দ্রনাথকে জানালেন, ছাত্ররা মাস্টারমশায়ের বিরুদ্ধে নালিশ করেছিল বিদ্যাসাগরের কাছে।

শুনেছি 'নরেন্দ্রনাথ ফোঁস করে ওঠেন। তিনি বলেন, কি বলছিস মাস্টারমশায় কি care করেন? তোর বিদ্যাসাগর বুঝি মনে করলে মাস্টারমশায়ের ছেলেপুলে আছে। তিনি আর চাকরি ছাড়তে পারবেন না।' (রামকৃষ্ণের অন্ত্যলীলা, দ্বিতীয় খণ্ড; স্বামী প্রভানন্দ; পৃ. ৩০১; উদ্বোধন কার্যালয়, ১৪০৯)

নরেন্দ্রনাথ ওরফে বিবেকানন্দ সাহসী কথা বললেও মাস্টারমশায় পরিবারবর্গ-সহ সত্যই আর্থিক বিপদে পড়ে গিয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ('রাষ্ট্রগুরু') তাঁকে সেই বিপদ থেকে রক্ষা করেন রিপন কলেজে (বর্তমান সুরেন্দ্রনাথ কলেজ) অধ্যাপনার পদ পাইয়ে দিয়ে। এ বিষয়ে নরেন্দ্রনাথ যে বাস্তবে তাঁকে কোনো সাহায্য করেছিলেন তার কোনো প্রমাণ নেই।

যাইহোক, উপরোক্ত ঘটনায় বিদ্যাসাগর সম্পর্কে বিবেকানন্দ যে তাচ্ছিল্যের মন্তব্য করেন তা কিছুটা হঠকারী বলে মানতে হবে। লক্ষণীয় 'কথামৃত'-তে বিবেকানন্দ অনেকের সম্পর্কে প্রসঙ্গ না উঠলেও প্রশংসা করতে দ্বিধা করেননি, একমাত্র বিদ্যাসাগর ছাড়া। মনে হবে বিদ্যাসাগর যেন কোনো উল্লেখ করার বিষয়ই নন! অথচ তাঁর সম্পর্কে প্রসঙ্গ তুলেছেন শ্রী'ম', ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার, স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণ। কিন্তু তিনি কখনো নিজের থেকে বিষয়টিকে আলোচনায় আনেননি।

দুই

অকস্মাৎ পিতার মৃত্যুর পর যখন দারুণ আর্থিক কষ্টে ভুগছেন, চাকরির জন্য দ্বারে দ্বারে ঘুরে ব্যর্থ হয়ে অনেক সময়ে অনাহারে থেকেছেন, সেই দারুণ বিপদের দিনে পরিচিতদের অনুরোধে বিদ্যাসাগর এগিয়ে এসে বিবেকানন্দকে মেট্রোপলিটান ইনস্টিটিউশনে (তখন তিনি অবশ্য নিছক নরেন্দ্রনাথ)-র বউবাজার শাখায় প্রধান শিক্ষকের চাকরি দিয়েছিলেন। কিন্তু সে চাকরি তিনি টিকিয়ে রাখতে পারলেন না এক মাসের বেশি। পারিবারিক মামলা-মোকদ্দমার ঝঞ্ঝাটে প্রায়শই তিনি স্কুলে অনিয়মিত হয়ে পড়লেন। বিদ্যালয়ের সেক্রেটারি ছিলেন বিদ্যাসাগরের জামাতা সূর্যকুমার অধিকারী।

ঘটনা সুস্পষ্টভাবে কী ঘটেছিল তা আজ পর্যন্ত সঠিকভাবে জানা যায়নি। তবে বিবেকানন্দ তাঁর পদে ইস্তফা দিয়েছিলেন। অনেকের ধারণা সূর্যকুমার অধিকারীর চাপেই তিনি এই ইস্তফা দেন এবং বিদ্যাসাগর তা জানতেন অথবা তাতে তাঁর সম্মতি ছিল। তবে একথা সুনিশ্চিত তাঁকে কোনো বরখাস্তের নোটিশ ধরানো হয়নি। হতে পারে যুবা বয়সের এই দুর্ভাগ্যজনক স্মৃতি বিদ্যাসাগর সম্পর্কে তাঁকে সারাজীবন তাড়িয়ে বেড়িয়েছে এবং যার ফলে মাঝেমধ্যে উপরোক্ত অসতর্ক উক্তি। তবে একই সঙ্গে মৃত্যুর মাত্র দুদিন আগে তিনি যখন সিস্টার নিবেদিতাকে আলমোড়ায় বললেন, 'রামকৃষ্ণের পর আমি বিদ্যাসাগরকে অনুসরণ করি।' ('After Ramrishna I follow Vidyasagar'); তখন সেটিকে ধরে নিতে হবে তাঁর সচেতন ও সতর্ক উক্তি। খুব সম্ভবত এক্ষেত্রে তিনি বিদ্যাসাগরের স্বাজাত্যাভিমানের কথাই উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ তাঁর স্পষ্টোক্তি এবং সাধারণ বেশভূষা।

কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও মনে রাখতে হবে ১৮৯১ সালে ২৯ জুলাই বিদ্যাসাগর যখন মারা যান তখন নরেন্দ্রনাথ সন্ন্যাস নিয়ে স্বামী বিবিদিশানন্দ হয়েছেন এবং উত্তর ভারতের বিভিন্ন সাধু-সন্ন্যাসীদের সঙ্গে দেখা করেছেন (যথা, ত্রৈলঙ্গ স্বামী, স্বামী ভাস্করানন্দ) অথচ ঘরের কাছে বাদুড়বাগানে তিনি কদাপি যাওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেননি। যদিও একদা তাঁরই গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ যেচে বিদ্যাসাগরের গৃহে সাক্ষাতের জন্য গিয়েছিলেন, যে কথা আজ কারো অবিদিত নয়। সার কথা, ঈশ্বরে বিশ্বাসী বিবেকানন্দের অজ্ঞেয়বাদী বা তথাকথিত 'নাস্তিক' বিদ্যাসাগর সম্পর্কে কৌতূহল সামান্যই হবে যদি তিনি কোনো ভক্তের মুখে শোনেন, 'একজন বলিলেন যে বিদ্যাসাগর মহাশয় ঈশ্বর, ব্রহ্ম কিছু মানেন না। তিনি বোঝেন জগতের কল্যাণ, বিদ্যাচর্চা— ইহাই প্রধান।' (জীবন সন্ধানী বিদ্যাসাগর; রামরঞ্জন রায়; পৃ. ১৬৪)

শংকরীপ্রসাদ বসু তাঁর অকাদেমি পুরস্কার প্রাপ্ত গবেষণাগ্রন্থ 'বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ' (তৃতীয় খণ্ড)-এ মেট্রোপলিটান স্কুলের বউবাজার শাখার প্রধানশিক্ষক হিসেবে বিবেকানন্দের কার্যকলাপ সম্পর্কে খুবই সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়েছেন। এই ঘটনাটি স্বামী গম্ভীরানন্দ তাঁর 'যুগনায়ক বিবেকানন্দ' গ্রন্থেও স্থান দিয়েছেন (প্রথম খণ্ড, পৃ. ১২২; সংস্করণ, ২০০২)। তবে তিনিও লিখেছেন অতি সংক্ষিপ্তভাবে। আর তাঁর ইংরেজি জীবনচরিত গ্রন্থে (লাইফ অব স্বামী বিবেকানন্দ; ইস্টার্ন অ্যান্ড ওয়েস্টার্ন ডিসাইকলস; পৃ. ১২২; সংস্করণ, ১৯৯৫) লেখায় সমগ্র বিষয়টি মাত্র পাঁচ লাইনে সীমাবদ্ধ রেখেছেন। তবে তাঁরা বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের তারিখটি দিয়েছেন, যা শংকরীপ্রসাদ দেননি। তারিখটি ছিল জুন, ১৮৮৬। ইংরেজি জীবনচরিতে লেখা হয়েছে উপরোক্ত চাকরি বিবেকানন্দ করেছিলেন মাত্র কয়েক সপ্তাহের জন্য। আর গম্ভীরানন্দ লিখেছেন, তিনি একমাস ওই চাকরি করেছিলেন। ইংরেজি জীবনচরিতের লেখকরা বলেছেন, পরিস্থিতির চাপে বিবেকানন্দ চাকরি পরিত্যাগ করেছিলেন। এখন দেখা যাক, শংকরীপ্রসাদ কী লিখেছেন? তিনি লিখেছেন, 'পিতার মৃত্যু হলে দুঃশ্চিন্তাগ্রস্ত নরেন্দ্রনাথ সামান্য সময়ের জন্য মেট্রোপলিটান স্কুলের বৌবাজার শাখার প্রধান শিক্ষকের চাকরি করেন। সে চাকরি অবশ্য বেশিদিন টেকেনি এবং সেজন্য নরেন্দ্রনাথ ঈষৎ অভিযোগ বোধও করতে পারতেন।' (পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ২৩৫)

লক্ষণীয়, চাকরি যাওয়ার ব্যাপারে নরেন্দ্রনাথের যে কিছু অভিযোগ থাকতে পারে সে কথা স্বামী গম্ভীরানন্দ বা ইংরেজি জীবনচরিতকাররা কেউই উল্লেখ করেননি তাঁদের লেখায়। এটি শংকরীপ্রসাদের নিজস্ব বক্তব্য। স্কুলের চাকরিটি যে নেহাত বিদ্যাসাগরের বদান্যতায় পেয়েছিলেন, সে বিষয়টি তিনি উল্লেখ করেছেন কেবল ফুটনোটে বা পাদটীকায়। মূল টেক্সটে স্থান পায়নি। সতর্ক পাঠক ছাড়া অন্যদের দৃষ্টি অতি সহজে এড়িয়ে যাবে।

ফুটনোটে শংকরীপ্রসাদ এ বিষয়ে যাবতীয় ঘটনার উল্লেখ করেছেন স্বামী নিত্যাত্মানন্দ সংকলিত "শ্রী'ম'-দর্শন" (চতুর্থ খণ্ড)-এর পৃষ্ঠা ৫৬ থেকে।

উদ্ধৃতি : 'বাড়ির লোক তখন খেতে পায় না। নরেন্দ্র ... চাকরির জন্য কত চেষ্টা করছেন। ... একদিন বিদ্যাসাগর মহাশয়কে আমরা বললাম। তিনি বৌবাজার হাইস্কুলের হেডমাস্টার করে দিলেন। (শংকরীপ্রসাদ বসু; পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পাদটীকা-২৪) 'শ্রীম-দর্শন' থেকে আরো জানা যায়, ফার্স্ট ও সেকেন্ড (বর্তমান ক্লাস টেন ও নাইন বা দশম এবং নবম শ্রেণি) ক্লাসের ছাত্ররা নরেন্দ্রনাথের নামে অভিযোগ করে যে তিনি পড়াতে পারেন না। আর সেই কথা শুনে বিদ্যাসাগর মহাশয় আমাকে বললেন, 'তাহলে নরেন্দ্রকে বলো আর না আসে...'। 'শ্রী-ম দর্শন'-এর মতে বিদ্যাসাগরের জামাতা সূর্যকুমার অধিকারী বিবেকানন্দকে 'সরিয়ে রাখতে' চেয়েছিলেন বলে তিনি 'ফন্দি' করে ছেলেদের দিয়ে বিদ্যাসাগরের কাছে অভিযোগ করিয়েছিলেন।

তিন

যে নিত্যাত্মানন্দের দেওয়া বিবরণকে শংকরীপ্রসাদ সাক্ষী হিসেবে খাড়া করেছেন, একটু লক্ষ করলেই দেখা যাবে তা পরিস্থিতির বিশ্লেষণে আদৌ টেকে না। কারণ বিবেকানন্দের মতো এক সুবক্তা ভালো পড়াতে পারেন না, একথা ছাত্ররা বললেও আদৌ বিশ্বাসযোগ্য নয়। এক সময়ের স্কুল ইনস্পেক্টর

এবং পরবর্তী সময়ের সংস্কৃত কলেজের দুঁদে অধ্যক্ষ বিদ্যাসাগর ছিলেন শিক্ষক নির্বাচনে পাকা জহুরি। একথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় তিনি শুধু নরেন্দ্রনাথের অভাব মোচনের কাণ্ডারীর ভূমিকা পালন করেননি, একজন সম্ভাব্য ভালো শিক্ষক হিসেবেই নির্বাচিত করেছিলেন। তা ছাড়া বিদ্যাসাগরের একটি সুবিদিত অভ্যাস ছিল, তিনি শিক্ষক ও ছাত্রদের অজ্ঞাতসারে দরজার আড়াল থেকে শিক্ষকের পাঠদান শুনতেন। সুতরাং নরেন্দ্রনাথের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম হওয়ার কারণ ছিল না।

শ্রী'ম' ছিলেন বিদ্যাসাগরের স্কুলের শ্যামবাজার শাখার প্রধানশিক্ষক, যে কথা পূর্বে একবার উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁর কাছ থেকে জানা যায় বিদ্যাসাগর পূর্বাহ্ণে না বলে যখন তখন স্কুল পরিদর্শনে আসতেন। এরকম একটি ঘটনার কথা তিনি লিখেছেন (১৮৮৩ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর), 'আজ স্কুল দেড়টার সময়ে ছুটি হয়ে গেছে। কারণ বিদ্যাসাগর এসেছিলেন। স্কুল বিদ্যাসাগরের...' (কথামৃত; দ্বিতীয় ভাগ, পৃ. ৬৫, সংস্করণ, ১৩৮৮), তা ছাড়া বিবেকানন্দ নিজেও ছাত্র বয়সে দেখেছেন যখন তিনি কিছু সময়ের জন্য বিদ্যাসাগরের স্কুলে পড়েছিলেন। কীভাবে সবার অজ্ঞাতসারে বিদ্যাসাগর শ্রেণিকক্ষের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতেন। একদিন সামান্য এক অপরাধে (নরেন্দ্রনাথ ক্লাসের মধ্যে মাস্টারমশায়ের অদ্ভুত মুখভঙ্গি দেখে হেসে ফেলেছিলেন)। শ্রেণিকক্ষের শিক্ষক যখন নরেন্দ্রনাথকে প্রচণ্ড মারছেন তখন বিদ্যাসাগর দরজার আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে শিক্ষককে ছাত্রদের সামনেই তিরস্কার করেন দারুণভাবে। (স্বামী বিবেকানন্দ; সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, সাপ্তাহিক বর্তমান; ১ এপ্রিল এবং ৮ এপ্রিল, ২০০৬)

আসলে বিদ্যাসাগর দেখতেন স্কুল নিয়মিত খোলা হয়েছে কি না এবং শিক্ষক ও ছাত্রদের হাজিরার ক্ষেত্রে নিয়মানুবর্তিতা। ইতিহাসবিদ অমলেশ ত্রিপাঠী বিদ্যাসাগরের জীবনী গ্রন্থে (বিদ্যাসাগর : দি ট্রাডিশনাল মডার্নাইজার) মন্তব্য করেন তিনি শিক্ষক এবং ছাত্র কোনো স্তরে বিশৃঙ্খলা বরদাস্ত করতেন না।

সুতরাং নরেন্দ্রনাথ খারাপ পড়াতেন এবং বিদ্যাসাগরের জামাই চক্রান্ত করে ছাত্রদের দিয়ে সেই অভিযোগ বিদ্যাসাগরের কানে তুলেছিলেন এবং সে কথা শুনে তৎক্ষণাৎ তিনি বললেন, 'তাহলে নরেন্দ্রকে বলো আর না আসে'— স্বামী নিত্যাত্মানন্দ যা আমাদের বোঝাতে চেয়েছেন তাঁর সংকলনে ('শ্রীম-দর্শন') তা কিন্তু পরিস্থিতির বিশ্লেষণে বিশ্বাস করা মুশকিল। তা ছাড়া জামাই যা বলবে বিদ্যাসাগর তা সরলভাবে মেনে নেবেন এমন স্নেহান্ধ শ্বশুর তিনি ছিলেন না। মনে রাখা প্রয়োজন এই জামাই সূর্যকুমারের বিরুদ্ধে সেক্রেটারি হিসেবে টাকাপয়সার গরমিলের অভিযোগ উঠলে বিদ্যাসাগর তৎক্ষণাৎ তাঁকে বরখাস্ত করতে দ্বিধা করেননি। গরমিলটা ছিল দু-তিন হাজার টাকার মতো। সুতরাং জামাইয়ের তথাকথিত চক্রান্তকে স্বীকার করে নেওয়ার পাত্র বিনা তদন্তে আর যেই হোক, বিদ্যাসাগর ছিলেন না, একথা নিশ্চিতভাবে বলা যায়।

প্রকৃত সত্য আজ পর্যন্ত অনুদ্ঘাটিত থাকলেও (পরবর্তী সময়ে বিবেকানন্দ এ ব্যাপারে নীরব থেকেছেন, এমনকী মৃত্যুর দুদিন আগে সিস্টার নিবেদিতার কাছে স্মৃতিচারণেও) যুক্তিসম্মত যে কথা অস্বস্তিকর হলেও অনুমান করা যায়, তা হল নরেন্দ্রনাথ ওরফে বিবেকানন্দকে পারিবারিক মামলা-মোকদ্দমার দেখভাল করার জন্য প্রায়শই আদালতে যাতায়াত করতে হত— ফলে অনিবার্যভাবে স্কুল হাজিরায় ঘটত অনিয়ম— যা নিশ্চয় সারপ্রাইজ ভিজিটে কঠোর নিয়মরক্ষক বিদ্যাসাগরের দৃষ্টি এড়ায়নি। স্বামী গম্ভীরানন্দের লেখা থেকে আমরা জানতে পারি পিতা বিশ্বনাথ দত্তের 'জীবনকালেই সম্পত্তি বিভাগের মোকদ্দমা শুরু হইয়াছিল' (পৃ. ১২০)। স্বভাবতই বাড়ির জ্যেষ্ঠ পুত্র হিসেবে পিতার মৃত্যুর পর তাঁকেই এ বিষয়ে নজর রাখতে হত এবং আদালতে হাজিরা দিতে হত। এটা সবাই জানে যে সিবিল মামলা দীর্ঘকাল ধরে চলে।

স্বামী নিত্যাত্মানন্দ লিখছেন, প্রধান শিক্ষকের পদে ইস্তফা দিলেও নরেন্দ্রনাথ কারো বিরুদ্ধে অভিযোগ করেননি, কারণ তিনি 'Noble Soul' 'মহাপুরুষ'। তাঁর ভাষায় 'না আত্মপক্ষ সমর্থন, না অপরের উপর অভিযোগ।' (শংকরীপ্রসাদ বসু, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পাদ-টীকা, পৃ. ২৩৫)

এ বিষয়ে মুক্তকণ্ঠে বলা যায় বিবেকানন্দ ছিলেন 'Noble Soul' 'মহাপুরুষ', তবে ঘটনাটি যদি সত্য হয় তা হলে তিনি কীভাবে আত্মপক্ষ সমর্থন করবেন? অপরের বিরুদ্ধে দোষারোপই বা কীভাবে করবেন?

নরেন্দ্রনাথের চাকরিতে ইস্তফা দেওয়ার ঘটনাকে গবেষক শংকরীপ্রসাদ বসু বোধহয় সহজভাবে গ্রহণ করতে পারেননি। তাই তিনি লিখেছেন, 'সে জন্য নরেন্দ্রনাথ ঈষৎ অভিযোগ বোধ করতেও পারতেন।' কিন্তু কিসে 'ঈষৎ অভিযোগ বোধ করতেও পারতেন,' সে বিষয়ে আশ্চর্যজনকভাবে নীরব। সমস্ত বিষয়টি তিনি ফুটনোটে স্বামী নিত্যাত্মানন্দের উপরে চাপিয়ে দিয়েছেন। বস্তুত এ বিষয়ে নরেন্দ্রনাথের তরফে অভিযোগ করার কিছুই ছিল না। হাইকোর্টে মামলার তদ্বিরের জন্য বিদ্যালয়ে আসা-যাওয়ায় অনিয়মিত হয়ে পড়া। ব্রহ্মচারী স্বরূপানন্দ তাঁর বইতে (স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও বাণী; পৃ. ৪৭, কলকাতা, ১৯৬৮) পরোক্ষে সেই ইঙ্গিতই দিয়েছেন। প্রথমে লিখেছেন, 'কিছুদিন বাদে মেট্রোপলিটান

ইনস্টিটিউশনে একটি শিক্ষকতা পেলেন।' আর তার পরের লাইনেই লিখলেন, পারিবারিক মামলার কথা এবং নরেন্দ্রনাথ তাতে কীভাবে জড়িয়ে পড়লেন তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

'শ্রীম-দর্শন'-এ বলা হয়েছে বিবেকানন্দ এক মাস চাকরি করেছিলেন। যতদিন না কোনো গবেষক জানাবেন ওই এক মাসে নরেন্দ্রনাথ স্কুল ছেড়ে আদৌ মামলার তদ্বিরের জন্য হাইকোর্টে যাননি, ততদিন বিদ্যালয়ে তাঁর নিয়মিত উপস্থিতি সম্পর্কে একটি যুক্তিসম্মত সন্দেহ থেকে যাবে। আবার অন্যদিকে ইতিহাসের ছাত্র-ছাত্রী মাত্রই জানেন, 'স্মৃতিকথা' এবং 'আত্মজীবনী' কখনো পাথুরে প্রমাণ হিসেবে গণ্য করা হয় না। এর মূল্য বিকল্প সাক্ষ্য হিসেবে।

সবশেষে কৌতূহলের বিষয় এত বড়ো ঘটনায় দুই মহান ব্যক্তি বিবেকানন্দ ও বিদ্যাসাগর কেউ কাউকে দোষারোপ করেননি। অথচ বিদ্যাসাগরকে কেন অভিযুক্ত করা হল তার উত্তর বোধহয় একমাত্র কবি ভারতচন্দ্রই দিতে পারেন— কারণ, তিনি লিখেছেন, 'বুঝ লোক যে জান সন্ধান'।

ছবি : তিতির বন্দ্যোপাধ্যায়

আজকের প্রাসঙ্গিকতায় বাংলার নবজাগরণ

প্রদীপকুমার ভাদুড়ি

জন্ম জন্ম ধরে বিশ্বাস আর ভক্তির জারক রসে আমরা ডুবে আছি। কোন ছোটোবেলায়, আমি শুধু নয়, আমার পিতৃদেবকে, তস্য পিতৃদেবকেও গিলিয়ে দেওয়া হয়েছিল— ‘বিশ্বাসে মিলায় বস্তু, তর্কে বহু দূর।’ এই ভক্তি এবং বিশ্বাসের প্রাবল্যেই বারে বারে ঠোক্কর খেতে খেতে আজকে এই একবিংশ শতকের দ্বিতীয় দশকে রাষ্ট্রীয় ভক্তিবাদের কঠিন নিগড়, উদ্ভট উদ্ভট সব অন্ধবিশ্বাস গিলিয়ে দেওয়া চলছে, আমরাও গিলে চলেছি। মেঘনাদ সাহা একসময়ে ব্যঙ্গ করে বলেছিলেন— ‘সব ব্যাদে আছে।’ বেদের খানিকটা যা জেনেছি, ঋগ্বেদে, সেখানে দেব স্তুতি এবং দাও দাও আর পাওয়ার জন্যে যজ্ঞ করো। আমাদের ভক্তি দর্শনের অধিকাংশই ভিক্ষাবৃত্তি অর্থাৎ জাতীয় চরিত্র বহুকাল ধরে গড়ে উঠেছে ভিক্ষা বৃত্তির পেশাগত অবস্থানে। অর্থাৎ ভিক্ষা দেবার আধিপত্য এবং ভিক্ষা নেবার অবনত মানসিকতা। এ হচ্ছে মূলস্রোতের দর্শন। আধ্যাত্মিকতার আবরণে ঢেকে মানুষকে গিলিয়ে দেওয়া চলে আসছে। ভারতীয়ত্ব যদি বলতে হয়, এই মূলস্রোতের মধ্যেই তা নিহিত নেই। অনার্য অংশ এবং পার্বত্য অঞ্চলে বসবাসকারীদের জীবনধারা, সেখানে বিবিধ ধর্ম ও সংস্কৃতি বহুকাল ধরে বহমান। নাস্তিক্যবাদ, সংশয়বাদ, অজ্ঞেয়বাদ, বস্তু বা ইহবাদ, যা প্রশ্ন করে, যা যুক্তি চায়, তা ভারতীয় দর্শনেরই অংশ। কিন্তু যেহেতু মূলস্রোত, তাই অন্য সমস্ত বাদকে নিশ্চিহ্ন করে আজকে বহাল তবিয়তে বেদভিত্তিক ব্রাহ্মণ্যবাদী জীবনাচরণের সংস্কৃতিকে সমাজে জোর করে ঢুকিয়ে দেওয়া চলছে। তাকে খানিক প্রযুক্তি, আধুনিকতার মোড়কে বাজার-চল করা চলছে, এটা করা হচ্ছে সমাজের নব্বই শতাংশ মানুষকে বুরবক বানিয়ে রাখার জন্যে। সবটাই চলছে মুষ্টিমেয় ধনীর স্বার্থে ভারতীয় জনগণকে শোষণের নিগড়ে বেঁধে রাখা। ছাপান্ন ইঞ্চির গলায় ‘মিত্রো’, কিন্তু সব শত্রু। একপেশে বাণী, একপেশে হুংকার, একপেশে মিথ্যাচার, একপেশে নির্দেশ। কোথাও কোনো প্রতিবাদের বালাই নেই। না হলে একটা রাজ্যকে মাসের পর মাস বন্দীশালা বানিয়ে রাখা হয়েছে, এখানে প্রতিবাদী ভারতের কোনো ভূমিকা নেই। এমনকী বাঙালি, যাদের কণ্ঠে রবীন্দ্রনাথ, কণ্ঠে গণসংগীত, বলা হয় প্রগতিশীল সংস্কৃতির কেন্দ্রভূমি— কিন্তু কর্মে ইদানীং দৃষ্ট প্রভুজি মাতাজির প্রতি অবনত প্রণতি ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। নাকি অসামান্যা অগ্নিকন্যা— তিনি ভিজে বেড়াল হয়ে গেছেন। ধর্মীয় হুজুগের লড়াই লাগিয়ে দেওয়া চলছে। বাঙালিদের মধ্যে এক ধরনের আন্তম্ভরিতা ছিল, আমরা ‘ইস্পেশ্যাল’। সংস্কৃতিতে, বিদ্যায়, রুচিতে, আধুনিকতায়। এখন দয়ে মজিয়েছে। বাঙালি এখন সন্তোষী মা থেকে শুরু হয়ে গণেশপুজো, হনুমানপুজো, কবচ তাবিজ, অসংখ্য গুরু-গুরুমাতা, গুরু পিতামহ-পিতামহী, তস্য প্রপিতামহ প্রপিতামহী মানে মানে হাড়ে মজ্জায় ঢুকে চলেছে। তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলছে ধর্ষণজাতীয় ঘটনার বাহুল্যে নারী জাতিকে অবলা এবং কোণঠাসা করে রাখার প্রক্রিয়া। মেয়েদের পণ্যায়ন চলছে এবং কাটমানি। কাটমানির ব্যাপকতা এমনই যে, বর্তমান এ রাজ্যের শাসক দলের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বলতেই কাটমানি বোঝায়। এর জন্যে কে আজকে দায়ী, সে গপ্পো ছেড়ে দিয়ে একবার ভাবি কেন বাঙালি জাতটা বারে বারে ধাক্কা খেতে খেতে যদিও ভাঙা কোমর সোজা করতে গেল, আবার ধাক্কা, আবার ঠোক্কর। উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা আছে, আবার ধুলোয় গড়াগড়ি আছে। এই বিচিত্র চরিত্র, মানসিকতা, এর জিনের বৈশিষ্ট্য এই যে, বাঙালি আদতে কোনো একটি জাত নয়, ভারতীয়রাও নয়, তবে বাঙালিদের মধ্যে উপজাতি ও দলিত গন্ধটা বেশি বলে, ওই যে বললাম, খানিক পা ঝাড়া, উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা— সেটা চালিয়ে যাচ্ছে। আজকে যাকে আমরা বলছি নৈরাজ্য, তার মেজরিটি অংশ, ওই দলিত, নিম্নবর্ণ, ওই আম-নিম্নবিত্ত বাঙালিদের অসহায় দুরাবস্থার সুযোগ নিয়ে ঢুকিয়েছে রাজনীতির আধিপত্যকারী কায়েমি অংশ। দরিদ্রের সঙ্গে অসহিষ্ণুতার এই যোগ আজকে নয়, এটাকে ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে বুঝে ওঠা দরকার। বাঙালির বিদ্রোহী চরিত্র আদতে আম নিম্নবর্ণের বাঙালির মধ্যেই প্রবহমান আমরা পেয়েছি তাদের অতীত সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে।

বিদ্রোহের চরিত্রের খোঁজ আমরা পাই বেদের বিরুদ্ধতা করার জন্যে চার্বাক দর্শনসহ বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মে। চর্যাপদের যে ভাব, তার সঙ্গে মিল রয়েছে চার্বাকবাদ বা লোকায়ত দর্শনের। বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যরা যে সৃষ্টি করে গেছেন, সোর্স খুঁজলে দেখা যাবে হয়তো, উত্তর ভারতীয় বেদভিত্তিক সমাজ, দর্শন অথবা জীবনযাপন, পৌত্তলিক চর্চা ইত্যাদি, সেগুলোর বিরোধিতার উৎস পূর্ব ভারতের চর্যাপদীয় ভাবনার অনুষঙ্গের মধ্যেই রয়েছে। চতুর্বর্ণ বিরোধী লোকায়ত ও সংশয়বাদী ভাবনার উৎপত্তি স্থলের সঙ্গে বাংলার সাযুজ্য পাওয়া যাচ্ছে। আজকের বাংলা নয়, যাকে বলা হত গঙ্গারিডি, কপিলাবস্তুর নিরীশ্বরবাদী সংশয়বাদী ভদ্রলোক, উত্তরের হাওয়ায় ভেসে আসা আর্য যাযাবরদের একমেবাদ্বিতীয়ম বেদ বিরোধী ছিলেন বলে, তাঁর উত্তরাধিকারীদের শোনা যায়, পুষ্যমিত্র শুঙ্গ লোকায়ত দর্শনসহ বৌদ্ধ জৈন ধর্মকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করতে করতে এবং পরবর্তীতে গুপ্ত যুগে ঠেলতে ঠেলতে, নিরীশ্বরবাদীদের ঈশ্বর না হোক গড বানিয়ে দিল। ফুল বেলপাতা, ধূপধুনো দিয়ে নিরীশ্বরবাদীদের মূর্তিপুজো চলেছে। এই সংশয়বাদ, সে কিন্তু উত্তর বা পশ্চিম ভারতের উৎপাদন নয়, অনুমান করা যায়, পূর্ব ভারত বা গঙ্গারিডি অঞ্চল থেকে উৎপন্ন।

আদত কথা এই যে লোকায়ত দর্শন, আজীবক, চার্বাক এবং বৌদ্ধ জৈন ইত্যাদি বেদ বিরোধী ও কারো কারো চতুর্বর্ণ বিরোধী দর্শনের সঙ্গে সহজিয়া ও সুফি মতবাদ থেকে চৈতন্য কৃত বৈষ্ণব ধর্ম, কোথায় যেন মিল রয়ে গেছে— এসবেরই মূল কথা মুক্ত ও স্বাধীন চিন্তা, ইহজীবনভিত্তিক সেই সঙ্গে মুক্ত বাঁধনহীন বর্ণভেদহীন জীবনযাপন। যদিও বুদ্ধ খানিক কড়া ধাতের লোক ছিলেন, তাই সংযম মার্গই সর্বক্ষেত্রে চালিত করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পরে বর্ণহীন সমাজের যে চরিত্র তার খানিক খামতি ঘটল, মহাযান পন্থায় ক্রমে ক্রমে ঢুকে গেল পৌত্তকিতার প্রভাব তৎসহ বিবিধ অনাচার। বৌদ্ধচর্চায় ফিরে এল বর্ণভেদ, কুসংস্কার, অন্ধতা। লোকায়ত ও চার্বাক মত বলছে, অর্থ ও কাম, এই দুই বর্গই মানব জীবনের লক্ষ্য বা পুরুষার্থ, ধর্ম বর্জনীয়। বর্ণভেদের বিপক্ষে, নারী পুরুষের সাম্যের পক্ষে জোরালো ভাবনা তুলে ধরেছিল লোকায়ত দর্শন। কামনা বাসনা প্রকৃতিদত্ত মানবিক প্রবৃত্তি তাদেরই কথা। অংশীদার নারীকে নীচে রেখে শুধুমাত্র সন্তান উৎপাদনের যন্ত্র হিসেবে ভাবনার থেকে মুক্তি দিয়েছিল লোকায়ত দর্শন। বৈষ্ণবসহ সহজিয়া ভাবনায় তাই।

এই সংশয়বাদী নচ্ছারদের জ্বালায়, মনু তথা সুমতি ভার্গব নামে এক ব্যক্তি নিদান দিলেন হিন্দুরা কেমন জীবনযাপন করবেন। বর্ণভেদ, যা ছিল এককালের গ্রামীণ গোষ্ঠী জীবনের নির্ধারিত কর্মবিভাগের সাধারণ পন্থা, তাকে সমাজের নির্ণায়ক এবং প্রজন্মভিত্তিক শক্তি হিসেবে তুলে এনে প্রথমে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের মধ্যেকার সংঘাত ও সমঝোতার পথ ঠিক করে নিয়ে, যৌথভাবে আক্রমণ শুরু হল নিম্নবর্গের ওপর। বেঁচে থাকার জন্যে তাদের একমাত্র কাজ হল বর্ণহিন্দুদের সেবা করা। ‘ত্যেন তক্তেন ভূঞ্জীথা। মা গৃধঃ কসাস্বিদ ধনম।’ অর্থাৎ ত্যাগের সহিত ভোগ করবে। কারো ধনে লোভ করবে না। অথচ আর্য সভ্যতাকাল জুড়ে শুধু ভোগ আর পর ধনে লোভ তার জন্যে যুদ্ধ, নারী ও সম্পদ লুন্ঠন এবং পুরুষ নারী নির্বিশেষে নিম্নবর্গ হিসেবে ক্রীতদাস করে রাখা। নারীজাতিকে কোণঠাসা করে সন্তান উৎপাদনের যন্ত্রে পরিণত করা হল। তমসার তীরে একদিন যে প্রাচীন আর্য ঋষিরা মানুষের মুক্তির পথ খুঁজছিলেন, সাম্যের ধ্বনি গুঞ্জরিত হচ্ছিল, তার অস্তাচল নেমে এল। ভক্তিবাদ ও অন্ধবিশ্বাসের যৌথ আক্রমণে বেচারা নিম্নবর্গের মানুষ, তারা সেদিনও মেজরিটি, আজও মেজরিটি কিন্তু শোষণের বেড়াজালে তাদের চোদ্দপুরুষ উদ্ধার করে দিল। নিরীশ্বরবাদীদের আখ্যা দিল পাষণ্ড। তাদের দর্শনকে আখ্যা দেওয়া হল আসুরিক দর্শন। পাষণ্ডদের আশ্রয়স্থলগুলো, শিক্ষা প্রদানের, তাদের জীবনচর্চার জায়গাগুলোকে পিষে দিয়ে ব্রাহ্মণ্যবাদের রথের চাকা যুগ যুগ ধরে চলতে থাকল। শক, হুনদল, পাঠানমোগল কত এল, গেল, কিন্তু ভারতীয় হিন্দু বর্ণভিত্তিক সমাজ এক জায়গায়। যার জন্যে রাগের চোটে কার্ল মার্কস বললেন, ‘সমস্ত মনোযোগের কেন্দ্রে খানিকটা ঘৃণ্য জমির টুকরো, সাম্রাজ্যের উত্থানপতন, অকথ্য নিষ্ঠুরতা। অপরাধ, বিশালাকার নগরের সমগ্র জনগোষ্ঠীর বেপরোয়া হত্যাকাণ্ড শান্তচিত্তে সবকিছুরই সাক্ষী হয়েছিল তারা, একমাত্র প্রাকৃতিক দুর্ভোগ ছাড়া তাদের জীবনে নেমে আসা আর কোনো অভিশাপকে তারা ধর্তব্যের মধ্যেই আনেনি।’

গুপ্ত যুগ থেকে মোগল যুগ, বাহিরের শক্তির প্রবল আক্রমণ, নানা ঝড়ঝঞ্ঝা, ভারতীয় মূল সমাজের অন্তর্কাঠামোর কোনো পরিবর্তন করতে পারেনি। সেই ক্রান্তিকাল এল ১৭৫৭ সালে, যেদিন পলাশির যুদ্ধে সিরাজদৌল্লার পরাজয় ঘটল। দেওয়ানি পেল ইংরেজরা। ব্যাবসা আর রাজস্ব সংগ্রহের দুর্মর অভিযানে ভারতের চলিত গোষ্ঠী জীবনকে ধাক্কা দিতে চাইল। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে বাংলার উচ্চবর্ণের সমাজের চিরাচরিত ব্রাহ্মণ্যবাদী সংস্কৃতির ফাটল ধরল। কিন্তু এ কলকাতাকেন্দ্রিক, গ্রাম বাংলায় সামন্তবাদী সমাজে এর প্রতিফলন জনজীবনে ঘটল না। কিছু বুদ্ধিজীবী, ইউরোপের নবজাগরণের সঙ্গে বাংলার নবজাগরণের মিল খুঁজতে গিয়ে তালগোল পাকিয়ে ফেলেন। ইউরোপের নবজাগরণ, তার ফলশ্রুতিতে চিকিৎসা, বিজ্ঞান, সাহিত্য, শিল্প-এর মধ্যে দিয়ে যে উদার, গোঁড়া ধর্মবিরোধী মুক্ত চিন্তার প্রকাশ ঘটেছিল, তার ক্ষেত্রটার

মূল মাটি ছিল ইটালি থেকে শুরু করে সমগ্র ইউরোপে। এই উদারনৈতিক চেতনার পেছনে ছিল সামন্ততান্ত্রিক কৃষি ব্যবস্থার জোয়াল থেকে মানুষের মুক্তি। তারই ফলে ফরাসি বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে এনলাইটেনমেন্টের যুগ। সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা— এই স্লোগান গর্জে উঠল শ্রমজীবী মানুষের কণ্ঠে। ১৭৮৯ সালের ফরাসি বিপ্লব, তার পরবর্তীতে ১৮৯৮ সাল থেকে দুবছর ফ্রান্সের শ্রেণি সংগ্রাম। এই ধরনের না হোক, ছোটো ছোটো শ্রেণি সংগ্রাম ভারতে এখানে ওখানে অসংগঠিত উপায়ে খানিক হলেও, উনবিংশ শতকে কেন, বিংশ শতকে কমিউনিস্ট পার্টির আন্দোলন ব্যতিরেকে সংগঠিত শ্রেণি সংগ্রাম গড়ে উঠল না। বস্তুত আজও, বামপন্থীরা ছাড়া শ্রেণি আন্দোলনের প্রতি অন্য দলগুলির অনীহা থেকে প্রমাণিত হয় ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলন এবং পরবর্তীকালে দেশের শাসকদলসহ অন্যান্য বুর্জোয়া দল আজও ব্রাহ্মণ্যবাদী সংস্কৃতির প্রতিভূ। সেই কারণে ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা। আজকে তো তা দুঃসহ।

মোগল আমলের পূর্বে ভারত কোনোদিনই ঐক্যবদ্ধ ছিল না। গুপ্ত যুগ থেকে পরবর্তী মোগল যুগে সাম্রাজ্য উপরি কাঠামোতে সমস্ত করদ ব্যবস্থা থাকলেও, অন্তর্নিহিত পরিকাঠামোতে বিবিধ আচার, বিবিধ ধর্ম, বিবিধ সংস্কৃতি ভারতীয় সমাজ বিচিত্রতায় ভরা ছিল। ভারতীয় সমাজ চিরকালই বিচিত্র সংস্কৃতির সংগমস্থল। কতগুলো ভাষা বলুন তো। বর্তমানে ভারতের ২০১১-এর আদমশুমারি অনুযায়ী মানুষ কথা বলে ১৯৫০০টি ভাষায়। ভাবা যায়, এ দেশের সাতানব্বই শতাংশ মানুষের জন্যে বাইশটা ভাষা চালু রয়েছে অষ্টম তপশিলিতে। দীর্ঘ দুশো বছর ধরে চেষ্টা করে। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকরা এই ভাষাগুলোকে মেরে ফেলতে পারেনি। এই সমস্ত ভাষাকে ভিত্তি করে যে বিচিত্র সংস্কৃতি ভারতে প্রবহমান, তাকে খতম করার জন্যে ইদানীং প্রচেষ্টা চলছে হিন্দি ভাষার আধিপত্য কায়েম করার। এক ভাষা, এক জাতি, এক দল বা নেতা— এই স্লোগান আজকের ফ্যাসিস্ট উত্তরসূরিদের। কত কোটি শবদেহের ওপর দাঁড়িয়ে এই দেশে ফ্যাসিজম্ নৃত্য করবে?

সে যা হোক, পূর্ব কথায় ফিরে যাই। বাংলার নবজাগরণ, যেটির চরিত্র নিয়ে বহু কথা, বহু মত চলে আসছে, কিন্তু আজও বিষয়টা হল, বাংলার সমাজ, বাংলার শিক্ষা সে সময়ে কেমন ছিল? সমাজের অন্ধকার এবং বৈষম্যের অর্থব্যবস্থার সঙ্গে শিক্ষার সম্পর্ক চিরকালই, সব দেশেই। সুতরাং বাংলার শিক্ষাব্যবস্থা কেমন ছিল সেটা জানা দরকার। বাংলার শিক্ষাব্যবস্থার সে সময়ে ছিল টোল চতুষ্পাঠীর আধিপত্য। অন্যদিকে মক্তব মাদ্রাসা। কিন্তু প্রশ্ন হল, কেন ইংরেজি শিক্ষার দরকার হল? বেশ তো টোল চতুষ্পাঠী, মাদ্রাসা মক্তব দিয়ে কাজ চলে যাচ্ছিল। না, চলছিল না। কারণ ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিস্তৃত হয়েছে। শুধুমাত্র কিছু দেশীয় সৈন্য দিয়ে এই দখলে রাখার কাজ করতে হলে কী ফল হয়, সেটা আমরা দেখেছি ১৮৫৭ সালে সিপাহি বিদ্রোহে। ওটা তো পরিণতি।

পলাশির যুদ্ধের পরে বাংলা বিহার উড়িশার দেওয়ানি লাভের পরেও ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভাবেনি, প্রায় দুশো বছর ধরে তাদের ঔপনিবেশিক শাসন চালাতে হবে। তাদের এক এবং অকৃত্রিম লক্ষ্য হল, যেনতেন প্রকারে ভারতের সম্পদ লুঠ এবং নবাব বনে যাওয়া ব্রিটিশ রাজকর্মচারীসহ ব্রিটেনের সম্পদ বৃদ্ধি। এইভাবে তিরিশ-চল্লিশ বছর কেটে যাওয়ার পরেও তাদের একমাত্র আকাঙ্ক্ষা সম্পদ ও রাজস্ব। ফলে পুরোনো সামন্তবাদী ব্যবস্থাকে পরিবর্তিত করে আইন করল ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। সামন্তবাদকে জিইয়ে রেখে রাজস্ব আদায়ের নয়া ফন্দি, মুৎসুদ্দি দেওয়ান, বেনিয়ান, গোমস্তা, তারা কোম্পানির ব্রিটিশ কর্মচারীদের পদলেহন করে বেশ খানিকটা শাঁসে জলে হয়ে উঠল। ফুর্তিফার্তা করে, বাবুগিরি করে টাকা ওড়াতে লাগল মোগল আমলের বড়োলোকদের অনুকরণে, তার পরেও যে অনেক থেকে যায়। টাকা খাটিয়ে রোজগার? সে তো শিল্প বা ব্যাবসা। কোম্পানি দেখল এদের যদি ব্যাবসা আর শিল্প করতে দেওয়া হয়, তা হলে কোম্পানির একচেটিয়া মুনাফার দফারফা। সুতরাং চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। এর মধ্যে দিয়ে জমিদারি কেনা শুরু হল। দ্বিতীয়ত, ভারতের যে সামন্তবাদী চরিত্র তাকে রক্ষা করলে আদতে কোম্পানির দুটো সুবিধে। এক, এ দেশ থেকে কাঁচা মাল নিয়ে গিয়ে ইংলন্ডের শিল্পের ব্যাপক প্রসার ঘটানো, এ দেশে বাজার তৈরি করা। দুই, রাজস্ব আদায়। এটা একটা বড়ো আয় ছিল কোম্পানির। কেননা ওই সময় ছোটো বড়ো জমিদারের সংখ্যা ছিল প্রায় ২ লক্ষ। সুতরাং সামন্তবাদী ব্যবস্থা উচ্ছেদ করে উদার দেশীয় বুর্জোয়া গোষ্ঠী তৈরি হল না, বরঞ্চ গেঁড়ে বসল। ভারতের গণশিল্পগুলোকে ধ্বংস করা হল। আধুনিক শিল্পের জন্যে এক আধজন শিল্পোদ্যোগী চেষ্টা করেছেন, তাও ব্রিটিশ কোলাবরেশনে। কিন্তু সেসব ধোপে টিকল না। ভারতীয় সমাজ, সংস্কৃতি পড়ে রইল পেছনে কূপমণ্ডূক বর্ণভেদভিত্তিক ব্রাহ্মণ্যবাদী সামন্তবাদী পুরোনো কাঠামোতে। দেশের আপামর নিম্নবর্গের সমাজ উপজাতিসহ অন্তরালে পড়ে রইল, শুধু মধ্যসত্বভোগী অংশের কিছুটা পাশ্চাত্য ভাবনায় জাগরিত হল। এটাই ইউরোপের নবজাগরণের সঙ্গে বাংলার নবজাগরণের অন্যতম পার্থক্য। আরো বেশি করে শুরু হল ছোটো বড়ো কৃষক শোষণ, অত্যাচার। বাংলায় অধিকাংশ হিন্দু মুসলমান কৃষিজীবী, নিম্নবর্গের মানুষ তারা ব্রাহ্মণ্যবাদী সামন্ত শাসনের বেড়াজালে নির্মমভাবে শোষিত হতে লাগল। ফলে ১৮৫৫ সালে সাঁওতাল

বিদ্রোহ, ১৮৫৭ সালে সিপাহি বিদ্রোহ, ১৮৫৯ সালে নীল বিদ্রোহ। এর পেছনে ছিল ভূমিব্যবস্থার অবর্ণনীয় অত্যাচার। ছবিটা আমরা দেখতে পাই দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটকে।

অনেক আগে থেকেই, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ থেকে ব্রিটিশ কোম্পানি তথা ব্রিটিশ সরকার মাথা চুলকোতে শুরু করেছিল, কেমন করে দেশের বর্ণহিন্দু ও কিয়ৎ পরিমাণ মুসলমান মধ্যসত্ত্বভোগীদের বশে রাখা যায়। সে সম্বন্ধে ভাবনা শুরু হল। ইংরেজি শিক্ষাটাও দরকার না হলে দেশীয় লোক দিয়ে কাজ করাবে কী করে? মিশনারিরা মাঝখান থেকে প্রবলেম করল। ব্যাঙের ছাতার মতো ইংরেজি শেখানোর স্কুল খুলল, নিজেদের জীবিকা অর্জনের জন্যে, আর সেই সমস্ত স্কুলে ইংরেজ ছাত্রদের সঙ্গে ফিরিঙ্গিরা এল, সেইসঙ্গে কতিপয় এদেশীয়। এর সঙ্গে মিশনারিদের কেরেস্তান করার কু-পরামর্শ। কোম্পানি দেখল মহা সমস্যা, ইংরেজি শেখা মানে আধুনিক শিক্ষা, ইউরোপের শিক্ষার খানিক আঁচ পড়লে এরা তো স্বাধীনতা এবং মুক্ত চিন্তার প্রশ্ন তুলতে পারে? তখনকার ইংরেজি পুস্তকাদির মধ্যে ছিল ইউরোপের নবজাগরণের প্রভাব, এনলাইটেনমেন্টের প্রভাব। ফলে যুক্তিবাদ, বিজ্ঞানমনস্কতা এবং তলে তলে ইহবাদ। সুতরাং মিশনারি হঠাও। আধুনিক শিক্ষা, না দেশীয় শিক্ষাব্যবস্থা, এই নিয়ে কোম্পানির ডিরেকটরদের মধ্যে মতদ্বৈধতা ছিল। তারা তো এসেছে এ দেশ লুট করতে পরোক্ষে প্রত্যক্ষে, সুতরাং দেশীয় উচ্চবর্ণ সামন্ত জমিদারদের চটিয়ে লাভ কী? টোল চতুষ্পাঠীর মধ্যে সংস্কৃত শিক্ষা আর মাদ্রাসা মক্তবের মধ্যে দিয়ে উর্দু। বাংলাদেশে সে সময়ে শোনা যায় টোল চতুষ্পাঠীর সংখ্যা ছিল প্রায় ষোলো শো। মাদ্রাসা মক্তবের সংখ্যা জানা নেই। তবে জনসংখ্যার আনুপাতিক হিসেবে মক্তব কমই ছিল কেননা বাংলায় অধিকাংশ কৃষক ছিল মুসলমান তারপরে হিন্দু।

এইসব টানাপোড়েনের মধ্যে দিয়ে ১৮১৪ সালে রামমোহন কলকাতায় এলেন ডিগবী সাহেবের দেওয়ানি ছেড়ে দিয়ে। আধুনিক শিক্ষার প্রতি আগ্রহ তৈরি হয়েছে তাঁর, পরিচয় হয়েছে ডেভিড হেয়ারের সঙ্গে। কলকাতার তৎকালীন মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সমাজের কেউ কেউ রামমোহনের সঙ্গে যোগ দিলেন। আত্মীয় সভা তৈরি করলেন রামমোহন। সেখানে খ্রিস্টান ও মুসলমান ধর্মের একেশ্বরবাদ ও হিন্দুধর্মের বেদান্তর সংমিশ্রণে কূপমণ্ডূক ব্রাহ্মণ্যবাদী আচারসর্বস্ব গোঁড়া সামাজিক প্রথাগুলোর বিরুদ্ধে শুরু হল একমেবদ্বিতীয়ম ব্রাহ্মচর্চা। তখনও ধর্ম হিসেবে নয়, এটা একটা চর্চা। ক্রমে দেশীয় শিক্ষিত শাহরিক সমাজ কূপমণ্ডূকতা থেকে বেরিয়ে লিব্যারাল সামাজিক ভাবনার দিকে ধাবিত হতে লাগল। কোম্পানি ১৮১১ সালের তাদের কলোনিয়াল শিক্ষানীতি অনুযায়ী উর্দু ও সংস্কৃতকে তোল্লা দিতে ইতিমধ্যেই কাশীতে সংস্কৃত কলেজ করেছে, কলকাতায় করেছে মাদ্রাসা। এখন তারা কলকাতায় একটি সংস্কৃত কলেজ স্থাপনের সিদ্ধান্ত নিল। কিন্তু রাজা রামমোহন বাদ সাধলেন। তাঁর নেতৃত্বে শিক্ষিত মধ্যবিত্তরা চাইলেন পাশ্চাত্য ধরনের আধুনিক ইংরেজি স্কুল। ইংরেজরা পাত্তাই দিল না। তখন রাজা রামমোহনের নেতৃত্বে ১৮১৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হল বেসরকারি 'হিন্দু স্কুল'। তখনকার কোম্পানির শাসনব্যবস্থার কেন্দ্রভূমি কলকাতার দেশীয় সমাজের চেহারা কেমন ছিল তার পরিচয় পাই ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কলিকাতা কমলালয়' ও কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতুম পেঁচার নকশা' গ্রন্থে।

রাজা রামমোহন রায় থেকে পরবর্তীতে যাঁরা ভারতীয় সমাজের লাইম লাইটে এলেন, তাঁদের কাজ হল শিক্ষা ও সমাজ সংস্কার করা। সেই সঙ্গে ধর্মকে সংস্কার করে খানিক উদার, বাজার চলতি করা। ভারতীয় সমাজ সংস্কৃতিতে ব্রাহ্মণ্য পেষণ নিপীড়ন, ব্যভিচার কুপ্রথা কুসংস্কারে নিমজ্জিত লোকাচারের হাত থেকে উঠতি পাশ্চাত্য আধুনিক মননের মধ্যবিত্ত মুক্তি চাইছিল। সেই পথ তৈরি করার চেষ্টা করলেন রাজা রামমোহন রায়। তিনি ছিলেন যথেষ্ট মেধাসম্পন্ন, আধুনিকমনস্ক, লিবারাল। তার সঙ্গে যোগ হল হিন্দু কলেজের আধুনিক শিক্ষার প্রভাব। ডিরোজিও শিক্ষক হিসেবে সেখানে যে শিক্ষা প্রবর্তনের চেষ্টা করলেন, খানিক বিভ্রান্ত হয়ে দেশীয় সামাজিক পরিমণ্ডলকে বিশ্লেষণ না করে, ছাত্ররা বস্তুত হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে আগ্রাসী আচরণ শুরু করল। জনজীবনের সাধারণ চাহিদার বিরুদ্ধে গিয়ে নিরীশ্বরবাদী ভাবনার দিকে ধাবিত হল এই ইয়ংবেঙ্গল গ্রুপ। অপরদিকে রাজা রামমোহন রায়ের প্রচেষ্টায় আত্মীয় সভা একেশ্বরবাদের প্রচার শুরু করল ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠা করে। তখন কলকাতায় ধর্মীয় সংঘর্ষ ও বাবু কালচারের ত্রিবেণী সংগম। অধিকাংশ শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ক্রমে ক্রমে ব্রাহ্মসমাজের ছাতার তলায় মিলিত হতে লাগল। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রাহ্মধর্ম প্রতিষ্ঠা করলেন। পরে এমনও দেখা গেল তৎকালীন সুপ্রিম কোর্ট রায় দিল যে ব্রাহ্মধর্ম হিন্দুধর্ম থেকে আলাদা। কিন্তু তা পরবর্তীতে ধোপে টিকল না হিন্দু পুনরুত্থানবাদীদের আধিপত্যে। হিন্দু ধর্মীয় পুনরুত্থানের ফলেই ঊনবিংশ শতকের ছয়ের দশক থেকে মাথা তুলতে শুরু করল বর্তমান হিন্দুত্ববাদের অঙ্কুর। ওদিকে মুসলিম মধ্যবিত্ত সমাজ, সংখ্যালঘু হলেও, তাদেরও মনে প্রশ্ন দেখা দিল, তারাও ভাবল, ঔপনিবেশিক শাসনের শাঁস জল হিন্দুরাই কেন একা উপভোগ করবে? উনিশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকেই আলাদা মুসলমান সত্তার ভাবনা শুরু হয়েছিল। পরে আলিগড়কে কেন্দ্র করে মুসলমান মধ্যবিত্ত আধুনিক শিক্ষার দিকে এগিয়ে গেল। তবে এই ধর্মীয় দ্বন্দ্ব, ধর্মীয় তর্কবিতর্ক, ঊনবিংশ শতকের বলা যায় দ্বিতীয় দশক থেকে, একমাত্র ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ব্রাহ্মণ পণ্ডিত

হয়েও, সুর মেলালেন না। শিক্ষা ও সমাজ সংস্কারের মধ্যে দিয়ে আধুনিক ভারত গড়ে তোলার ভাবনার সঙ্গে ধর্মকে তিনি মেলালেন না। শিক্ষা ও সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে রাজা রামমোহনের অগ্রণী ভূমিকা থাকলেও, বস্তুত বিদ্যাসাগরকে আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষ ভারতের পথিকৃৎ বলা যায়। তাঁর সহসাথি ছিলেন মদনমোহন তর্কালংকার, অক্ষয়কুমার দত্ত প্রমুখ। আধুনিক শিক্ষা ও বিধবা বিবাহ বিষয়ে বিদ্যাসাগরের ভাবনাকে আমরা আলোচনার মধ্যে নিয়ে এলেও, যে বিষয়টা প্রায়শই উহ্য থাকে তা হল বিদ্যাসাগরই বলতে গেলে আধুনিককালে ভারতীয় দর্শনের বস্তু বা ইহবাদী ভাবনাকে সামনে এনেছিলেন। সর্বদর্শন সংগ্রহ অনুবাদ করে চার্বাক দর্শনকে মানুষের গোচরে এনেছিলেন। এই কাজগুলোতে তিনি যে দৃঢ়তার পরিচয় দিয়েছিলেন, তা এই শতাব্দীর প্রথমার্ধেও প্রাসঙ্গিক। তিনিই স্পষ্ট বলেছিলেন বেদান্ত ও সাংখ্য দর্শন ভ্রান্ত, যদিও কারো কারো ব্যাখ্যায় প্রশ্ন আছে সাংখ্য দর্শনকে ভ্রান্ত বলা সঠিক নয়। হিন্দুধর্মের আচারসর্বস্বতা, কূপমণ্ডুকতা, কুসংস্কারের দুর্গে তিনিই প্রথম আঘাত হেনেছিলেন। তৎকালীন সামাজিক পরিমণ্ডলে ধর্মবর্ণ নির্বিশেষে জনগণের তীব্র চাহিদা ছাড়া কোনো বৈপ্লবিক সমাজ রূপান্তর সম্ভব ছিল না। ব্যাপক সাংগঠনিক প্রক্রিয়ার মধ্যে না গিয়ে নিম্নবর্ণের অন্ত্যজ সমাজের জাগরণ করা সম্ভব ছিল না। সে জাতীয়তাবোধ বা সাংগঠনিক প্রক্রিয়া ভারতীয় সমাজে যখন তৈরি হল, তার নিয়ন্ত্রণ চলে গেল বর্ণহিন্দু মধ্যসত্ত্বভোগীদের হাতে, এদের বড়ো অংশই ছিল ব্রিটিশ সরকারের প্রতি জীবনজীবিকার ক্ষেত্রে নির্ভরশীল। তার চেয়ে বড়ো কথা, দেশের কৃষিব্যবস্থার ওপর নির্ভরশীল ভূস্বামী ও জমিদাররা নিজেদের স্বার্থের বিরোধী নিম্নবর্ণের জাগরণের বিপক্ষে ছিল শ্রেণিগত স্বার্থে। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে বস্তুত আধিপত্য ছিল, মধ্যবিত্ত বর্ণহিন্দুদের দ্বারা পরিচালিত ও তাদের স্বার্থে সংস্কারমূলক আন্দোলন। কমিউনিস্টরা সেভাবে প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। মুসলমানরা আগ্রহ প্রকাশ করল না, বরঞ্চ কিছু মুসলমান কমিউনিস্টদের প্রতি আগ্রহশীল হয়েছিল। নিম্নবর্ণের অন্ত্যজ ও উপজাতি মানুষদের জাগরণের কোনো ভূমিকা গ্রহণ করেনি স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রমুখরা। পরবর্তীকালে স্বাধীনতার পরে এই নিম্নবর্ণের অন্ত্যজ মানুষরাই আজকে নৈরাজ্যবাদী ও সাম্প্রদায়িক অংশের হাতের ক্রীড়নক। তাদেরকেই ব্যবহার করা চলছে ক্ষমতায় থাকার জন্যে। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিও শ্রেণি সংগ্রামে এই নিম্নবর্ণের মানুষদের মধ্যে আধুনিক শিক্ষা ও সংস্কৃতির জাগরণের কোনো প্রচেষ্টা করেনি। শ্রেণিস্বার্থেই ভারতে ঐক্যবদ্ধ বিকাশশীল বহুমুখী জাতীয় চরিত্র গড়ে উঠল না। ব্রিটিশ সরকারের তাঁবেদার হিসেবে হিন্দু ও মুসলমান মধ্যবিত্তদের যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা, সেই প্রতিদ্বন্দ্বিতাই জন্ম দিল সাম্প্রদায়িকতার। কলোনিয়াল ইংরেজরা ভারতের সামন্তবাদী ও সাম্প্রদায়িক চরিত্রকে উশকানি দিয়েই নিজেদের হিস্যা যোলোর জায়গায় আঠেরো আনা বুঝে নিত। সুতরাং নিজেদের স্বার্থেই ভারতের রাজন্যবর্গসহ শিক্ষিত মধ্যবিত্ত অংশকে নিজেদের তাঁবে রাখতে সচেষ্ট ছিল বিভিন্ন ছলচাতুরীর মাধ্যমে। শিক্ষা বলো, সমাজ বলো, যা চলছে তাই চলুক, কিন্তু আমাদের চাই মুনাফার বাড়বাড়ন্ত। যেমনটা আজকে। রামমোহন রায় ধর্মের উদারতার আহ্বানকে এবং সতীদাহ প্রথা বিরোধী আইনকে সামনে রেখে এবং বিদ্যাসাগর শিক্ষা ও সমাজ সংস্কারের আন্দোলনে যে প্রগতিমুখীনতা আনয়ন করলেন, আজকের ভারতের রাষ্ট্রযন্ত্রের আধিকারিকরা তাকে অপসৃত করতে চাইছে। জোয়ারের সময়ে নদীর স্রোত সাময়িক পশ্চাদ্‌মুখী হয়, কিন্তু স্রোতের স্বাভাবিক চরিত্র পশ্চাদ্‌মুখীনতা নয়। তেমনই ভারতীয় আধুনিক সমাজকে, ভারতীয় আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে যারা পশ্চাদমুখীন করতে চাইছে, ব্রাহ্মণ্যবাদী আচারসর্বস্ব, অন্ধ বিশ্বাস ও ভক্তিবাদের অন্ধকারে ঠেলে দিতে চাইছে বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে, ফ্যাসিস্ট শক্তির এই আজকের আধিপত্য সমাজবিজ্ঞানের প্রগতিশীল পথের বিরুদ্ধাচরণ। ভারতীয় সমাজ এ মেনে নেবে না। কারণ বাংলার নবজাগরণের কালের চেয়ে আজকের ভারতীয় সমাজ অনেক বেশি শ্রেণি সচেতন। ক্রমাগত মাত্রাতিরিক্ত শোষণের ফলে জনচেতনায় বিক্ষোভের বুদবুদ তৈরি হয়ে চলেছে, তা বিস্ফোরণের অপেক্ষায়। মানুষের কাছে পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে ধর্মীয় ছলনা, সামাজিক, সাম্প্রদায়িক ও আগ্রাসী যুদ্ধ-আতঙ্ক তৈরি করে বস্তুত কর্পোরেট পুঁজির চূড়ান্ত শ্রীবৃদ্ধি করাই বর্তমান শাসক দলের লক্ষ্য। কিন্তু এ অসম্ভব।

তথ্যসূত্র

১। ভারতবর্ষের ইতিহাস —ইরফান হাবিব

২। বিকল্প নবজাগরণ —জয়ন্তানুজ বন্দ্যোপাধ্যায়

৩। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও উনিশ শতকের বাঙালি সমাজ —বদরুদ্দীন উমর।

৪। বিদ্যাসাগর: নানা প্রসঙ্গ —রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

অশ্বাণা কচুরিপানা

গৌতমকুমার দাস

কচুরিপানা জলজ বীরুৎ, পদ্মের কদর এর নেই, ডাঁটায় খাটো, তাই লাউ বা কাটোয়া নটের ডাঁটার মতো বাজার-ভরতি থলে থেকে রান্নাঘরে ঢোকা বারণ, রসালো ঘন সবুজ মসৃণ পাতা থাকলে কী হবে ভূরিভোজের পর পানের মতো মুখশুদ্ধি হওয়া এর কপালে নেই, তাই কচুরিপানা অচ্ছুৎ, গৃহস্থমাত্রেই। একে গৃহস্থে, পুকুরে দেখলে, আদর যত্ন দূর অতীত, দূরছাই করে ছুঁড়ে ফেলে পাড়ে। হবে নাই বা কেন, স্বদেশি হলে মানুষে, অন্তরের কিছুটা ভালোবাসা, কিন্তু কচুরিপানা এ দেশেরই নয়। স্বনক নামের একজনের, পর্যটক শুনেছি, তাঁর খুবই পছন্দের, কচুরিপানা ফুল, খানিক অর্কিড ফুলের মতো, তাই দেখে তিনিই, ব্রাজিলের আমাজন থেকে, এদেশে, ১৯০০ সালের কিছু আগে-পরে, সঠিক বছরটি কোথাও লেখা নেই। কচুরিপানার কিন্তু কৃতজ্ঞ থাকা উচিত অমন মানুষের প্রতি, নইলে এমন সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা বাংলা, তার জলাভূমি, মাত্র বিশ বছরেই, ১৯২০-তে, কচুরিপানার দখলে। বাংলায় সজল পরিবেশে, এত নদীনালা খাল বিল পুকুর ডোবা, ভরতি-জল, থইথই, তাতেই তরতর করে বেড়ে ওঠা, প্রায় সর্বত্রই। বাঙালি চিনেছে কচুরিপানা, সেই থেকে, আর কচুরিপানায় ঢেকেছে বাংলার জলাভূমি। এবং এতটাই যে, কচুরিপানা উচ্ছেদের আইন আনতে বাধ্য হয়েছে ব্রিটিশ ইন্ডিয়ার অধীনে নির্বাচিত বাংলা সরকার, ১৯৩৬ সালে। কচুরিপানার মতো দাপট, এই বাংলায়, অন্য কোনো গাছগাছালির, অতটা বল নেই, যে কারণে বাংলার জলাভূমি আইন, বাংলার মিউনিসিপ্যালিটি আইন, বাংলার স্থানীয় সরকার আইন, বাংলার স্থানীয় গ্রাম সরকার আইন বদলাতে হয়, সংশোধনে বাধ্য হতে হয়। এমনকী কচুরিপানা, তখনকার অখণ্ড বাংলার নির্বাচনি ইস্তাহারে, সবকটি রাজনৈতিক দলেরই, তাতেই বাজিমাত, একপ্রকার। নির্বাচনে জিতে, কচুরিপানা সংহারে, পূর্ণ শক্তিতে, বাংলার জলাশয় থেকে জলাশয়ে, কচুরিপানার অভিশাপ-মুক্ত বাংলা গড়ার ডাক, শের-এ বাংলা এ কে ফজলুল হক সাহেবের।

বাংলা জুড়ে যার এত অনাদর, সেই কচুরিপানা দক্ষিণ পাকিস্তানের সিন্ধের প্রাদেশিক ফুল। এ জাতে আগাছা, কাণ্ডে খর্বাকার, থোকা পাতা, পাতার বোঁটা খাটো, স্ফীত, ভেতরে বায়ু, গঠনে একরকম প্যারেনকাইমা কলা, নাম এরেনকাইমা, এয়ার অর্থাৎ অক্সিজেন-যুক্ত, বায়ুধারণে জলে ভাসে। পুষ্পমঞ্জরী ১৫-২০ সেমি লম্বা, তাতে ৮-১০টি ফুল, ৬ পাপড়ির ফুলের থোকা, দৃষ্টিনন্দন বেগনে-কালো, অথবা সাদা-বেগনের মিশেল, কখনো হালকা আকাশি রঙেও, প্রজাতিভেদে। ফুল ফোটে অক্টোবর-জানুয়ারি মাসে। অর্কিডের মতো ফুল, ফুল তুলে হাতে নিলে, নেতিয়ে পড়ে নিমেষেই, তাই কচুরিপানার অমন সুন্দর ফুল, না সুন্দরী ললনার খোঁপার শোভায়, না দেবস্থানে, কোথাও এর ঠাঁই নেই। কচুরিপানা বংশবৃদ্ধির সক্ষমতায় এর জাতভাইদের তুলনায় বেশ এগিয়ে, দুসপ্তাহেই দ্বিগুণ। এর বীজও তেমনি, ত্রিশ বছরেও, সজীবতায়, অঙ্কুরোদ্গমে। কচুরিপানার সাত প্রজাতি, সেভেন সিস্টারর্স, তবে গ্রামবাংলার প্রায় সর্বত্রই যার দেখা মেলে, তার বিজ্ঞানসম্মত নাম আইকরনিয়া ক্রাসিপেস। জার্মান সেনাবাহিনীর মতো, অকুতোভয়ে, কচুরিপানা, যে-কোনো ধরনের জলাভূমি, দৌরাত্ম্যে অধিকার কায়েম, বাংলাদেশে তাই, কোথাও কোথাও একে জার্মানিপানা, নেত্রকোনায় জার্মুনি, চাঁদপুরে কস্তুরি, নদিয়ায় সফেসিয়ানা।

কচুরিপানার গাথায়, সাঁতরাগাছি ঝিল, আসেই। ওখানে পরিযায়ী পাখিরা, ফি-বছর, শীতের অতিথি। ওদের ঘোরাফেরা, বাসা বাঁধা, ডানা মেলা, রোদ্দুরে ওড়া, সবই ঝিলের মাঝে, কচুরিপানায়। ঝিল ভরে কচুরিপানায়, বর্ষায়। কচুরিপানার সাফাই শুরু কার্তিক-অঘ্রানে। ১৩.৫ একর ঝিলের শতকরা নব্বই ভাগ ঢাকা পড়ে কচুরিপানায়। ওয়েস্ট বেঙ্গল বায়োডাইভার্সিটি বোর্ডের অর্থ অনুদানে, হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটি কর্পোরেশনের লোকবলে, স্থানীয় প্রকৃতি-প্রেমিকদের উদ্যোগে, সাফাই অভিযান চলে। এ কাজে এ বছর ৩.৩ লাখ টাকায়, ১৫০০ ঘন্টা মানব শ্রমদানে, কচুরিপানা সাফ।

তবে কচুরিপানা ফেলনা নয়, সমস্ত কচুরিপানা জড়ো করে, ১৩টি দ্বীপ, ঝিলের জলেই, ভাসমান বায়ো-দ্বীপ, ইতিউতি, ঝিলের প্রায় ৩০ ভাগ অংশ জুড়ে। কচুরিপানার ভাসমান দ্বীপগুলিতে পরিযায়ী পাখির উড়ে আসা, বিশ্রাম, বাসা বাঁধা, ওঠাবসা, নিদ্রা, রাতভর। কচুরিপানা না থাকলে পাখি বাসা বাঁধে না। দূরদূরান্ত থেকে উড়ে এসে বসা, থাকা বা বাসা বাঁধায় জমি না পেলে, তারা উড়ে যায় অন্য কোথাও, যেখানে সুবিধা মেলে। ঠিক যে কারণে ২০১৭ সালে সাঁতরাগাছি ঝিলে পাখিরা সংখ্যায় নগণ্য। ওই বছর হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটি কর্পোরেশনের তরফে ঝিল থেকে সমস্ত কচুরিপানা তুলে সাফ করে দেওয়ায়, শীতের পরিযায়ী অতিথিরা আসে, কিন্তু তাদের অধিকাংশ থাকেনি, বাসা বাঁধেনি। সে বছর পাখির সংখ্যা হাতে গোনা, মাত্র ৮০০। পরের বছর ২০১৮-তে, কচুরিপানার এমনই ভাসমান দ্বীপে, প্রকৃতি-প্রেমিকদের ভাবনায়, পাখি আসে, থাকে, বাসা বাঁধে, সংখ্যায় বেড়ে দাঁড়ায় ২৮৮৯। তবে সাঁতরাগাছি ঝিলে পাখির যাতায়াত নিম্নমুখী, ২০১৪-১৫য় ৬৯৮৪, ২০১৬-১৭য় ৫২৩২, ২০১৭-১৮য় ৮০০, ২০১৮-১৯-এ ২৮৮৯। প্রকৃতি-প্রেমিকরা এবারও আশায় আশায়, কচুরিপানার ভাসমান দ্বীপে পাখি এবার ভরে যাবে, তাই যেন হয়।

শুধু সাঁতরাগাছি ঝিল নয়, প্রায় সব জলাভূমিতেই বংশবৃদ্ধির হার, কচুরিপানার, এতটাই যে, মাসখানেকেই, একটি ডোবা বেগনে রঙের ফুলের কচুরিপানায় টইটম্বুর, এসব দেখেই গান বাঁধেন কবিয়াল গুরুদাস পাল—

‘থাকিলে ডোবাখানা হবে কচুরিপানা
বাঘে হরিণে খানা একসাথে খাবে না
ও মরি, স্বভাব তো কখনো যাবে না।’

কচুরিপানার পুকুরের জল শীতল, তাতে শরীর স্নিগ্ধ-নির্মল, দু-ই, তবে ঠান্ডার মাত্রায় সর্দির উপদ্রব, বাউল সংগীতে তারই কথা—

‘পানা পুকুরে চান করে সর্দি লেগেছে
দিয়ে নাকে নস্যি মেরে হাঁচছি
এই শরীর ঝালাপালা করেছে।’

এপার বাংলার কবির কচুরিপানা নিয়ে কবিতা, ছোটো বড়ো মাঝারি, চোখে পড়েনি। ওপার বাংলার এম এস ফজলুল হাসানের আস্ত একটি কবিতা, কচুরিপানার, তার প্রথম চার লাইন— ‘নদীর ঘোলাতে অস্বচ্ছ জল/সাদা-বেগুনী ফুল থোকায় থোকায় কচুরিপানা, তুমি কি দেখেছ কভু প্রিয়া/সবুজ আভায় ভাসমান আলপনা’ অথবা মাঝের এক পঙ্‌ক্তি— ‘নাহ্! তুমি কখনো ভাবনি এমন করে/ময়লা নর্দমায় কিংবা ঘোলাটে নদীতে/কচুরিপানা জন্মায় বলে/তোমার কাছে এর মূল্য নেই কিছুই/কিন্তু আমিও যে এক কচুরিপানা/ছুটছি জীবনের লক্ষ্যহীন পথে।’ গানে তেমনটা হয়তো নেই, কিন্তু আক্ষেপে কচুরিপানা— ‘হায়রে কচুরিপানা বাংলার কৃষক তোরে চিনল না’। বাংলার কৃষক কিন্তু কচুরিপানা ঠিকই চিনেছে, নইলে কচুরিপানার ব্যবহারে, বেশি ফলনে, অর্থকরী ফসলে বাংলার চাষিই, বরং যথাযথ প্রয়োগে বা দিশা দেখানোয় বিজ্ঞানের দেখা নেই। চাষিরা তাই, চাষির মতোই, নিজস্ব রীতিতেই, কচুরিপানা তুলে এনে মাঠে, রোদ্দুরে শুকিয়ে, বড়োসড়ো গর্ত খুঁড়ে, মাটি ও ছাই-সহ, আট-দশ মাস, তৈরি কম্পোস্ট সার, ওই জৈব সারে ফলন বাড়ে, ফসল হয় মানে গুণে উত্তম। কচুরিপানা পচিয়ে কম্পোস্ট সারে, ফসফরাস ও পটাশিয়াম থাকায়, উর্বরতা বেড়ে তো যায়ই, মাটির গুণ ও অনুজীবেরও একাধিক চাষবাসে, কোনোরূপ ক্ষতি হয় না। মাটির অনুজীব, মাটির মধ্যে বায়ু চলাচলে, মাটির সজীবতা রক্ষায় সাহায্যে আসে। কচুরিপানার কমপোস্ট সারে মাটির অনুজীব মরে না, এর ঠিক বিপরীত ফল হয় রাসায়নিক সারের ব্যবহারে, প্রয়োগে।

কচুরিপানায় বাঙালের ভাসমান চাষ, যেখানে খেত সাত-আট মাস জলতলে, ওখানে জলের ওপর গুটিকয় বাঁশ পেতে মই, তাতে বিছিয়ে কচুরিপানা, স্তরে স্তরে পরপর, তিন-চারদিন অন্তর, কয়েকদিন। হপ্তা দুয়েকে কচুরিপানা পচে, শুকোয়, তখন সবজি খেত, ওখানে লাল নটে ডাঁটা নটে, কলমি মুলো পালং ইত্যাদির বীজ বুনে দিতে হয়। প্রচুর সবজির ফলন ওখানে, যাতে গার্হস্থ্য-দাবি মেটে, তার ওপর হাটে বিক্রিবাটায় তেল মশলার খরচ বাঁচে। জলস্তর বাড়লে কচুরিপানার এমন ভাসমান সবজি খেত ওপরের দিকে, জল কমলে তলায়, সবজি ফলনে যদিও এই ওঠানামার কোনো প্রভাব নেই। আর জল একেবারে শুকিয়ে গেলে ভাসমান সবজি খেতের বেড মাটিতে, তখন পচা কচুরিপানা জৈব সার, ফসল চাষের কাজে আবারও। শুধু বাঁশগুলি সরিয়ে পৃথকীকরণ, প্রয়োজনে, পরের বছর, ফের সবজি চাষের কাঠামোয়। বরিশাল নেত্রকোনা জুড়ে, এমন ভাসমান সবজি চাষ, ফি-বছর। এপার বাংলায় কোথাও ভাসমান কচুরিপানার বেডে এমন সবজি চাষ চোখে পড়েনি। ভাসমান কচুরিপানার সবজি চাষের বেড সাধারণত লম্বায় ৬০ মিটার ও ৩ মিটার চওড়া— বরিশালের অধ্যাপিকা মহুয়া শবনমের কথায়। কচুরিপানার স্ফীত অংশে মাছ, গ্রাস কার্প, সিলভার কার্প, আমেরিকান রুই, এদের স্বাদু খাবার। তা ছাড়া, মাছচাষিরা, যে যার পুকুরের এক কোণে, কচুরিপানার স্তূপের ওপর খইল কুঁড়া ইত্যাদি, কচুরিপানা পচে খাবার, মাছে খায়, স্বাদে বাড়ে। বড়ো বড়ো বিলের যেখান থেকে কচুরিপানা তুলে সার বানায় চাষি, ওই কচুরিপানা শূন্যস্থানে খাপলা জাল ফেলে জেলে। এভাবেই কচুরিপানা আলুবীজ রোপনে, চা-চারার গোড়ায়, সদ্য ঢালাই ছাদ বা পিচ রাস্তায় জল ধারণে,

আসবাবপত্র তৈরি, কত কাজেই না আসে। জল থেকে কচুরিপানা তুলে, পাতা কেটে, রোদে শুকিয়ে, ওপরের আস্তরণটুকু সরালে, পাওয়া যাবে ফিতের মতো আঁশ। কাঠ বা স্টিলের তৈরি আসবাবপত্রের কাঠামোয়, যেমন বসার চেয়ার, সোফা সেট, টি-টেবিল ইত্যাদিতে জড়িয়ে নিলে শৌখিন আসবাব, মনে হবে বেতের তৈরি, ভ্রম হতেই পারে।

এই বাংলায় কচুরিপানার দাপট রুখতে একসময় কচুরিপানা আইন, এবার কচুরিপানার বাড়বাড়ন্ত রুখতে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, এবছরে। এই পরিকল্পনা রূপায়ণে একটি আন্ত কমিটি, যেখানে দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ে, ওয়েস্ট বেঙ্গল বায়োডাইভার্সিটি বোর্ড, হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটি কর্পোরেশন, নেচার মেট নামের এক বেসরসকারি সংস্থার প্রতিনিধিরা থাকবেন। প্রধান লক্ষ, সাঁতরাগাছি ঝিলে কচুরিপানার বাড়বাড়ন্ত নিয়ন্ত্রণ ও তার জন্য বছরভর ঝিলের দেখভাল। এযাবৎ সাঁতরাগাছি ঝিলে শীত মরসুমের আগেভাগে ঝিলের কচুরিপানা পরিষ্কার করে নেওয়া হত, আর বাকি দিনগুলিতে কচুরিপানা স্বাধীনভাবে বেড়ে উঠে ঝিলের জল ঢেকে দিত, তা আর হবে না। এ ছাড়াও দক্ষিণ-পূর্ব রেল অন্যান্য ঝিলগুলির সঙ্গে সাঁতরাগাছি ঝিলের মেলবন্ধন ঘটাবে, উদ্দেশ্য জলপ্রবাহ নিয়ন্ত্রণ। হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটি ঝিল লাগোয়া নর্দমা নিকাশিগুলি পরিষ্কার রাখবে, যাতে বৃষ্টিতে নর্দমার নোংরা জল ঝিলের জলে না মেশে, তাতে পুষ্টি উপাদান পেয়ে ঝিলের কচুরিপানার লাগামছাড়া বৃদ্ধি। বেসরকারি সংস্থা নেচার মেট মিঠে জলের ঝিনুক সংগ্রহ করে ঝিলের জলে ছাড়বে, পুষ্টি উপাদান শোষণে ঝিনুক বেশ কাজের। পুষ্টি উপাদান কমানো-সহ কচুরিপানা নিয়ন্ত্রণে এমনতর আয়োজন, কিন্তু কচুরিপানা ছাড়া পাখি আসবে না। কচুরিপানার ওপরেই পরিযায়ী পাখির ওঠাবসা, বিশ্রাম, প্রজনন। তাই কচুরিপানার কাছে ডানাওয়ালা এই শীতের অতিথিদের ঋণ কোনো অংশে কম নয়, ঋণী বাংলার চাষি জেলে সম্প্রদায়। কচুরিপানা নিজে অঋণা, তাই অন্যের ঋণের হিসেব রাখে না, বরং সে, স্বধর্ম বজায় রেখে, পুকুর ডোবায় জেগে বসে থাকে, অথবা ভেসে বেড়ায় পদ্মায়-গঙ্গায়।

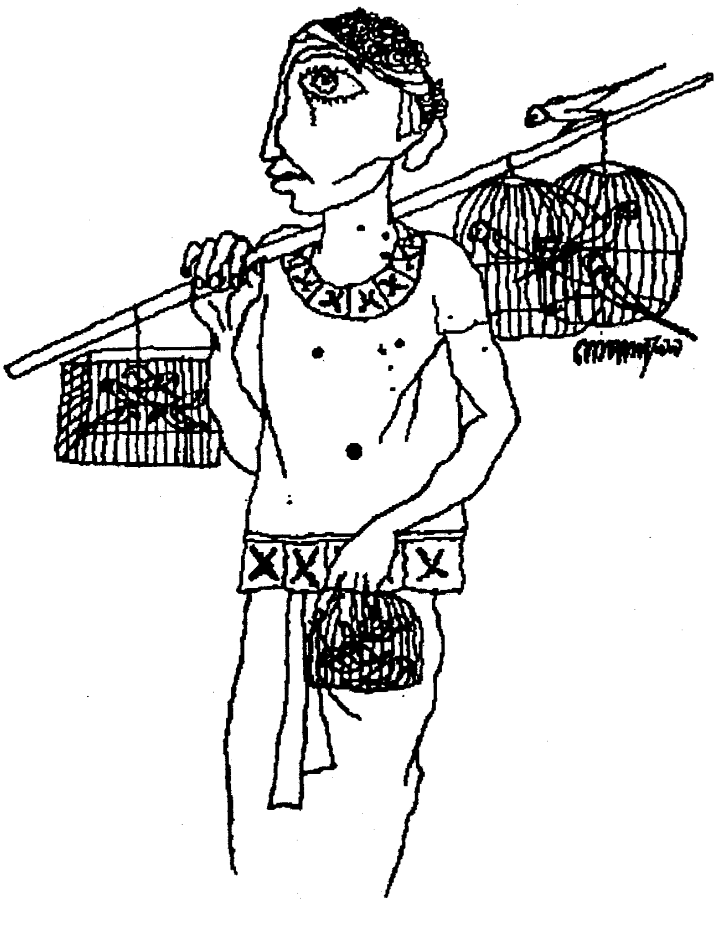

ছবি : গোপাল সান্যাল

চিঠির বাক্সো

আরেক রকম-এর বিগত ১৬-৩১ ডিসেম্বর সংখ্যায় আমার 'যদি মসজিদ ভাঙা না হত'—শীর্ষক লেখাটিতে দুটি ছাপার ভুল রয়েছে যার সংশোধন জরুরি। সেই কারণেই এই চিঠি। প্রথমত ২১ পৃষ্ঠার নীচের দিকে 'মন্দিরের প্রতিশ্রুত ভিত্তিস্থাপন' ১৯৯১ নয়, ১৯৮৯ সালের নভেম্বরে হয়েছিল। তখনও রাজীব গান্ধী জীবিত ছিলেন। আরো আগে প্রধানমন্ত্রী পদে তিনি থাকার সময়েই বিতর্কিত জমির ভিতরে রামমন্দিরের ভিত্তিস্থাপনের অনুমতি মিলেছিল।

দ্বিতীয়ত ২৩ পৃষ্ঠার ওপর দিকে *আরেক রকম*-এর ছাপাখানার ভূত সংস্কারমুক্ত ইতিহাস রচনার অন্যতম পথিকৃৎ আর এস শর্মাকে 'আর এস এস শর্মা-য় পরিণত করেছে। এই ভুল কোনোক্রমেই *আরেকরকম*-এর পাতায় থাকা উচিত নয়। আশা করি এই সংশোধন প্রতিবেদনটি আপনারা পরের সংখ্যায় প্রকাশ করবেন।

মালিনী ভট্টাচার্য
কলকাতা

মালিনী ভট্টাচার্যের গুরুত্বপূর্ণ নিবন্ধে গুরুতর ভুল থাকার কারণ আমাদের অসাবধানতা। এই অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য আমরা লেখক ও পাঠকের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী। —সম্পাদকমণ্ডলী

পুনঃপাঠ

সুরজিৎ দাশগুপ্ত ৮৫ বছর বয়সে সম্প্রতি প্রয়াত হয়েছেন। তিনি হলেন প্রকৃত অর্থেই একজন সাহিত্যপ্রেমিক। নিতান্ত তরুণ বয়স থেকেই তিনি তাঁর মায়ের উৎসাহে সাহিত্যরচনার পাশাপাশি কবিসাহিত্যিকদের সঙ্গে যোগাযোগ গড়ে তোলেন। মা ছিলেন উত্তরবঙ্গে সরকারি হাসপাতালের চিকিৎসক। ফলে তরুণ সুরজিৎ চিঠিপত্রের মধ্য দিয়ে যোগাযোগ শুরু করেন জীবনানন্দ দাশ সুধীন্দ্রনাথ দত্ত অন্নদাশঙ্কর রায় প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রমুখের সঙ্গে। পরে দেখাসাক্ষাৎ হতে থাকে। এইভাবে সাহিত্যানুরাগীর এক মূল্যবান স্মৃতির ভাণ্ডার গড়ে তোলেন তিনি। অরুণ ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'উত্তরসূরি' পত্রিকায় কবিতা ও প্রবন্ধ লিখে তিনি অনেকের কাছেই পরিচিতি লাভ করেন। *আরেক রকম* পত্রিকাতেও তাঁর একাধিক নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। এখানে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধানিবেদন হিসেবে, *আরেক রকম*-এ প্রকাশিত, তাঁর দুটি নিবন্ধ পুনর্মুদ্রণ করা হল।

কলকাতাতে কবিসঙ্গ

সুরজিৎ দাশগুপ্ত

১৯৫৬-তে শুরু। শুরু হল যাদবপুর সেন্ট্রাল পার্কে আমার কলকাতাবাস। বাড়িটার কিছুটা তৈরি হয়েছিল, কিন্তু মিস্ত্রির কাজ চলছিল। ছাদ, বাথরুম, ইলেকট্রিক লাইন হয়ে গিয়েছিল। আমি পুবের একটা ঘর নিলাম, উত্তরে ছোটো ঘরে ইলেকট্রিকের মিটার বক্স। পাঁচ-ছ-টা বাড়ি দূরে দিদিমার বাড়ি, তিনি স্বামীর মৃত্যুর পরে পণ্ডিতিয়ার বাটা কোম্পানির দেওয়া বাড়ি ছেড়ে সেন্ট্রাল পার্কে নিজের বাড়ি করেছিলেন। তাঁর কাছেই আমার খাওয়া-দাওয়া। তিনি উত্তর-কলকাতার সিমলা পাড়ার মেয়ে। রাঁধুনি হিসেবে নাম ছিল। স্বামী বিবেকানন্দর ভাই কলকাতায় এলে ডাক পড়ত তাঁর। ভূপেন দত্ত বলতেন, কলকাতার সেরা রাঁধুনি।

এমন সময় কলকাতায় এলেন অন্নদাশঙ্কর রায়। একদিন সেন্ট্রাল পার্কেও এলেন। উঠেছিলেন গড়িয়াহাট রোডে মণীন্দ্রলাল বসুর বাড়িতে। বললেন, লেভেল ক্রসিং ছাড়া চমৎকার জায়গা। তখন ঢাকুরিয়া ব্রিজ হয়নি, ছিল লেভেল ক্রসিং। লেভেল ক্রসিং পেরোলে বাঁ-দিকে ঢাকুরিয়া, ডান দিকে যোধপুর ক্লাব, যা অচিরে পরিচিত হয় যোধপুর পার্ক নামে।

সেন্ট্রাল পার্কে গুছিয়ে বসে প্রথমে গেলাম প্রেমেনদার কাছে, তারপর মণীন্দ্রলালের বাড়িতে, সেখানে অন্নদাশঙ্কর এসে উঠেছেন। তাঁর যোগাযোগেই বিশ্বভারতীতে ভর্তি হওয়া ও হস্টেলে জায়গা পাওয়া, এবার তিনি দেখতে চাইলেন সেন্ট্রাল পার্কের বাড়ি। দেখে খুশি হলেন। ছোট্ট বাথরুমের প্রশংসা করলেন। বললেন, 'বাথরুমই সভ্যতার পরিচয়।'

তারপর একদিন গেলাম সুধীন্দ্রনাথের রাসেল স্ট্রিটে। বললেন, 'এত তাড়াতাড়ি সেরে উঠবে ভাবিনি।' তিনি তখন ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব পাবলিক ওপিনিয়ন-এ কলকাতা শাখার কর্তা। ডিভিসি ছেড়ে দিয়েছেন। একদা শেক্সপিয়রের কিছু সনেট অনুবাদ করেছিলেন, সেগুলো সংশোধন করছেন। কিছু শোনালেন। বললেন পুরোনো কবিতাও কিছু নতুন করে শুধরে লিখছেন। 'আমি আজকাল পুরোনো গদ্যগুলোও নতুন করে লিখছি।' শুনে বললাম, 'জীবনানন্দ আপনার এই স্বভাবের কথা বলেছিলেন— নিজেকে ক্রমাগত শুদ্ধ করে চলেছেন।'

শুনে মৃদু হেসে বললেন, 'ডিড হি?' তারপর বললেন, 'তিনি নিজেও তো তাই করতেন। বুদ্ধদেব তাঁর কবিতার ফ্যাক্সিমিলি পাবলিশ করেছেন। হি ওয়াজ নেভার এ স্পন্টেনিয়াস পোয়েট।' কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলেন। বললেন, 'আই ওয়াজ শক্‌ড্‌। ডিডন্ট নো হিম ক্লোজলি। কিন্তু তাঁর শকিং ইনসিডেন্ট-এর পরে আই ওয়েন্ট টু হিজ ব্রাদার্স প্লেস ইন দ্য মর্নিং। দ্য ডেড বডি ওয়াজ স্টিল দেয়ার। কিছু রজনীগন্ধা রেখে এসেছিলাম। কনডোলেন্স জানিয়ে এসেছিলাম তাঁর ভাই-ভাইবউকে।'

আমি দেখলাম সুধীন দত্ত কোনো চাকরি বেশিদিন করেননি।

কিছুদিন স্টেটসম্যান-এ, কিছুদিন ডিভিসি, কিছুদিন পাবলিক ওপিনিয়নের ইনস্টিটিউটে, তারপরে যাদবপুর ইউনিভার্সিটি কমপ্যারেটিভ লিটারেচরের অধ্যাপনা।

তবে যাদবপুরে যোগ দেওয়ার আগেই তিনি আমাকে বলেছিলেন, তুমি এমএ পড়া শুরু করে বিকজ অব হেল্‌থ্ জলপাইগুড়ি চলে গেলে। যেটা শুরু করেছিলে সেটা এবার শেষ করো। এর পর থেকে তাঁর কাছে গেলেই ওই কথাটা বলতেন ভাঙা রেকর্ডের মতো। আমি ভাবতাম তিনি নিজে তো এমএ পাশও করেননি, কিন্তু তাঁর তো ভালো চাকরির অভাব হয়নি।

আর একদিন রাসেল স্ট্রিটে গেছে, উঠছি সিঁড়ি দিয়ে। সুধীনবাবু ও আর একজন নামছেন কথা বলতে বলতে। 'আমরা একটু বেরোচ্ছি টলি ক্লাবে' বললেন সুধীনবাবু। 'তুমি কোথায় যাবে?' বললাম, 'এখন আর কোথায় যাব? বাড়িতেই ফিরে যাই।' পালটা শুধোলেন, 'ইউ মীন যাদবপুরে?' আমি 'হ্যাঁ' বলাতে বললেন, 'চলো তোমাকে এগিয়ে দিই।'

জেফির গাড়িতে চড়ে বললেন, 'এমএ পড়ার কথা কিছু ভেবেছ?'

বললাম, 'আমি জার্মান পড়ছি।'

বললেন, 'খুব ভালো। তার সঙ্গে এমএ-টা পড়ো। তোমার বাড়ির কাছেই তো যাদবপুর ইউনিভার্সিটি। ওখানে লেজেন্ডারি প্রোফেসর সুশোভন সরকার আছেন। বুলু, ওকে সুশোভনের বাড়িটা বুঝিয়ে দাও তো।'

তখন সঙ্গী বুলু আমাকে বোঝালেন এলগিন রোডে সুশোভন সরকারের বাড়ি।

সুধীনবাবু বললেন, সুশোভনের সঙ্গে দেখা করে আমাকে এসে বলবে কী বললেন প্রফেসর সরকার।'

আমাকে গোলপার্কে নামিয়ে দিয়ে সাদার্ন অ্যাভিনিউ দিয়ে চলে গেলেন টলি ক্লাবের উদ্দেশ্যে।

গোলপার্ক আমার জীবনের একটা মোড় হয়ে থাকল। এলগিন রোডে প্রফেসর সরকার বললেন, যাদবপুর ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি চলছে। টাকা জমা দিয়ে ভর্তি হয়ে যেতে।

সেন্ট্রাল পার্কের বাড়ি থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় হেঁটে ১৫-২০ মিনিট।

এখানেই আমার মঞ্জু চৌধুরীর সঙ্গে পরিচয়, প্রণয় ও পরিণয়।

যাদবপুরে আমি এক বছর ড্রপ করে মঞ্জুর সঙ্গে ১৯৬২-তে এমএ পাশ করি।

সুধীনবাবুর কাছে গিয়ে দেখি তিনি নিজে যাদবপুরের তুলনামূলক সাহিত্যের অধ্যাপক হয়েছেন এবং একজন ছাত্রী ও একজন ছাত্রের প্রশংসাতে পঞ্চমুখ— একজন নবনীতা দেব, অন্যজন অমিয় দেব। তাঁরাও বোধহয় ১৯৬৩ কি ৬৪ সালে এমএ পাশ করেন। সুধীন দত্ত জানান, তাঁরা কলকাতার আদিবাসী, তখন কলকাতার নাম ছিল গোবিন্দপুর। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কলিকাতা, গোবিন্দপুর ও সুতানুটি তিনটে অঞ্চলকে জুড়ে কলিকাতা বা ক্যালকাটা করে। গোবিন্দপুরে বানায় ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ। গোবিন্দপুর থেকে তাঁরা চলে যান সুতানুটি। তাঁদের আদি নিবাসের স্মৃতি থেকে যায় চৌরঙ্গি রোড-এর পশ্চিমে মনোহর তড়াগে। মনোহরদাস দত্ত ছিলেন তাঁদের এক পূর্বপুরুষ। তাঁদের গ্রাম দখলের বদলে তাঁদের জমি দেওয়া হয় সুতানুটির হাতিবাগানে। এককে দিন পুরোনোদিনের কথা তাঁকে পেয়ে বসত।

একদিন তাঁর বারান্দায় এলেন দিব্যেন্দু পালিত। এখানেই তাঁর সঙ্গে পরিচয় ও বন্ধুত্ব। তিনি ও কমপ্যারেটিভ লিটারেচারের ছাত্র। এইসময় সুধীন্দ্রনাথ ধুতি-পাঞ্জাবি পরা শুরু করেন। একদিন এলেন শিবনারায়ণ রায় ও অরুণ ভট্টাচার্য। দুজনেই রয়-ইস্ট মানে মানবেন্দ্রনাথ রায়ের বিপ্লবী মানবিকতাবাদী। মানবেন্দ্রনাথ রায় ও এলেন রায়-এর ভারতীয় বুদ্ধিজীবী মহলে গভীর প্রভাব। অরুণ ভট্টাচার্যকে আমি আগে থেকেই চিনতাম। তাঁর 'উত্তরসূরী' পত্রিকাতে আমি কবিতা লিখতাম, লিখেছি অনেক। মনে হয় সুধীন্দ্রনাথ বিশেষ পছন্দ করতেন শিবনারায়ণ রায়কে।

আর একদিন সুধীন্দ্রনাথের স্ত্রী রাজেশ্বরী দত্তের সঙ্গে এলেন তাঁদের বন্ধুকন্যা বাঁশি মিত্র। তিনি দত্তদম্পতির বন্ধু বীরেন্দ্র মিত্রের মেয়ে, যাদবপুরে ইংরেজি পড়ান। তাঁর ভালো নাম ছিল বাঁশরী।

বেশ কিছু পরে সুধীন দত্ত ও রাজেশ্বরী দত্ত ধীরেন মিত্রর বাড়িতে নেমন্তন্ন খেয়ে রাসেল স্ট্রিটে আসেন। দুজনেরই মদ্যপান বেশি হয়েছিল। রাজেশ্বরী উঠতে পারছিলেন না ওই পর্বতপ্রমাণ সিঁড়ি। সুধীন দত্ত তাঁকে পাঁজাকোলা করে চারতলার ফ্ল্যাটে তোলেন। এখানে বলে রাখি, সুধীন দত্তের দেহসৌষ্ঠব ছিল গ্রিক ডিউনিসাসের মতো অপরূপ। একদিন গিয়েছি— বেয়ারা বলল, সাব, গোসলে গেছেন কিছুক্ষণ পরে কোমরে তোয়ালে জড়িয়ে খালি গায়ে হাত দিয়ে চুল ঠিক করতে করতে এসে বললেন, 'ও, তুমি? প্লিজ ওয়েট।' বলে হাফ প্যান্ট ও হাওয়াই শার্ট পরে এলেন। তখনই দেখেছিলাম তাঁর অনাবৃত বাহু ও বক্ষ।

আর ধীরেন মিত্রর বাড়ি থেকে দুজনে কীভাবে ফেরেন সেকথা শুনি তাঁর ছোটো ভাই সৌরীন দত্তর কাছ থেকে। তিনি থাকতেন রিজেন্ট পার্কে একটা বাগানওয়ালা নিজস্ব বাড়িতে। এখানেই সুধীন দত্তের স্মরণসভা হয় ও অতিথিদের ভোজনে আপ্যায়ন করা হয়। একইসঙ্গে স্মরণসভা ও ভোজনসভা।

সুধীন্দ্র দত্ত যাদবপুর পড়ানোর সময়ই উইল করেন। তাঁর সমস্ত বই-এর স্বত্ব পাবে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কেয়াতলার

বাড়ি প্রথম স্ত্রী ছবি, লাভ লক প্লেস-এর বাড়ি রাজেশ্বরী দত্ত। রাজেশ্বরী সে বাড়ি দেন সৌরীন দত্তকে, সৌরীন দত্ত দেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়কে।

লাভলক প্লেস-এ এখন ভাড়া থাকেন আমার প্রয়াতা স্ত্রীর বউদি ও তাঁর মেয়ে, নাতনি। ভাড়া দেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়কে। আমার স্ত্রীর বউদির অবশ্য নিজস্ব ফ্ল্যাট আছে আলিপুরে সোনালি অ্যাপার্টমেন্টসে। সেটা কাউকে ভাড়া দেওয়া আছে— কাকে জানি না।

জলপাইগুড়ি জেলা স্কুলের হেডমাস্টার তামসরঞ্জন রায় ১৯৪৮ সালে বদলি হয়ে যান। সে বছর আমি অষ্টম শ্রেণি থেকে নবম শ্রেণিতে উঠি দ্বিতীয় স্থান দখল করে। বন্ধু পাই নির্মল সান্যালকে। নিমু ছিল নবম শ্রেণিতেই। ওর দশম শ্রেণিতে ওঠার কথা ছিল। ফেল করে একই শ্রেণিতে থেকে যায়। ওর ফেল করার কারণ খুব অদ্ভুত। ওর পাঠ্যবইয়ে মন ছিল না, মন ছিল গল্প-উপন্যাস পড়াতে। 'শ্রীকান্ত'-র প্রথম খণ্ড ওর মুখস্থ ছিল, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'শিলালিপি'-র পৃষ্ঠাবিশেষ-ও সে গড়গড় করে বলতে পারত। পাঠ্যবই ছেড়ে গল্প-উপন্যাস পড়ার নেশাতে সে এমন মেতে ছিল যে পরীক্ষার পড়া করতে পারেনি, ফলে ফেল করে।

নিমুই আমাকে প্রথম পড়ায় অন্নদাশঙ্কর রায়ের 'আগুন নিয়ে খেলা', 'পুতুল নিয়ে খেলা' 'অসমাপিকা' প্রভৃতি। তারপর পড়ায় 'পথে প্রবাসে'— এটা ভ্রমণকাহিনি হলেও উপন্যাসের মতোই সুখপাঠ্য। নিমুর দিদি অরুণা সান্যাল ছিলেন ফরোয়ার্ড ব্লকের নেত্রী এবং আজাদ হিন্দ পাঠাগারের একজন কর্ত্রী। এই পাঠাগার থেকে নিমু আমাকে অন্নদাশঙ্করের বই এনে দিত। 'পথে প্রবাসে'-র পরে পড়ায় 'জীবনশিল্পী'— মুখ্যত রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কিত। এটা পড়ে বইটির প্রকাশক জিএম লাইব্রেরির প্রযত্নে অন্নদাশঙ্করকে চিঠি লিখি। জীবন আর শিল্প নিয়ে প্রশ্ন।

অচিরে উত্তর এল পোস্টকার্ডে। লিখলেন যে বিষয়টা বিস্তৃত আলোচনাসাপেক্ষ। এই মুহূর্তে তাঁর হাতে সময় নেই বড়ো চিঠি লেখার। কখনো দেখা হলে আলোচনা করা যাবে। তাঁর ঠিকানা ছিল আয়রন সাইড রোড।

এর পরে পড়ি 'যার যেথা দেশ'। উপন্যাস, কিন্তু তার সঙ্গে একটা ছোটো ভূমিকা। উপন্যাসের সঙ্গে ভূমিকা সেই প্রথম দেখলাম। বাদল আর সুধীরের গল্প। দুজনে পরম বন্ধু, কিন্তু বাদলের বিশ্বাস ইংল্যান্ডের জীবনই মানুষের জন্য আদর্শ জীবন, আর সুধীরের বিশ্বাস ভারতই হল মানুষের সাধনা করার মতো আদর্শ জীবন। বাদলের বাবা মহিম সেন বাদলকে ইংল্যান্ডে যেতে দেবেন একটা শর্তে— বাদল যদি কোনো বাঙালি মেয়েকে বিয়ে করে বিলেতে যায়। শুরুটাই বুঝিয়ে দেয় যে একটা জটিল গল্প গড়ে উঠতে চলেছে।

কাহিনি গড়িয়ে গেল পরের খণ্ড 'অজ্ঞাতবাস'-এ। 'অজ্ঞাতবাস' শুরু করে আমি অন্নদাশঙ্করকে আবার চিঠি লিখলাম। তিনি উত্তর দিলেন, এই কাহিনি বারো বছর ধরে ছন্দে লিখেছি। বাকি চার খণ্ড পড়লে খুশি হব।

এইভাবে আমাদের চিঠি লেখালেখি চলতে থাকল। ইতিমধ্যে তিনি লিখেছিলেন যে তিনি স্বেচ্ছা-অবসর নিয়ে সাহিত্যসাধনার জন্যে দেশের গভীরে শান্তিনিকেতনে বাস করতে যাচ্ছেন। তাঁকে শান্তিনিকেতনের ঠিকানায় চিঠি লেখা শুরু করি।

বাদল গিয়েছিল লন্ডনে। গরমের ছুটিতে আমি গেলাম শান্তিনিকেতনে। সে যে কী দারুণ গরম শান্তিনিকেতনে। উঠলাম গেস্ট হাউসে। সেটা একটা দোতলা বাড়ি, পাশে রঙিন কাচের ঘর অর্থাৎ মন্দির। গেস্ট হাউসে চৌবাচ্চার জলে স্নান করে মাছ-ভাত খেয়ে একটা আম গাছের ছায়াতে ঘুম। পাখির ডাকে ঘুম ভাঙল, নাকি পাখিদের ডানা ঝাপটানিতে ফেলা ঝরাপাতাতে ঘুম ভাঙল বুঝতে পারিনি। গেস্ট হাউসে এসে ম্যানেজারের কাছে জানতে চাইলাম অন্নদাশঙ্কর রায়ের বাড়ি কোথায়।

তাঁর নির্দেশমতো বাড়িটাতে এলাম। সামনের জমি ঢালু হয়ে নেমে গেছে একটা ডোবা বা ছোটো পুকুরে। তার জল লাল গেরি। মাটিও লাল গেরি। বেশ বড়ো বাগান, কিন্তু ছোটো ছোটো গাছগুলো শুকনো। মাটি থেকে ধাপ তিনেক উঠে বারান্দা, তার গায়ে ঠেসান দেওয়া সাইকেল। দরজায় পর্দা ঝুলছে। এদিক-ওদিক তাকাচ্ছি। হঠাৎ পর্দা সরিয়ে বারান্দায় বেরিয়ে এলেন মাঝবয়সি ব্যক্তি, পরনে সাদা ফুলপ্যান্ট, গায়ে সাদা হাফ শার্ট। হাতে টেনিস র‍্যাকেট। আমার সঙ্গে দু-চারটে কথার পরে আবার পর্দা সরিয়ে ভেতরে গেলেন। আমি বাগানে রাখা মোড়াগুলোর একটাতে বসে আছি। একটা কালো কুকুর এসে আমার গা শুঁকতে লাগল। কুকুরটার পিছনে একটি ফুটফুটে ফ্রক পরা মেয়ে এসে জিজ্ঞেস করল আমার নাম। তারপর কুকুরটাকে ডেকে কোথায় চলে গেল।

পর্দা সরিয়ে অন্নদাশঙ্কর বেরিয়ে এলেন। পরনে খদ্দরের ধুতি, গায়ে গেরি রঙের পাঞ্জাবি, ফুলহাতা। হাতে মাঝারি মাপের টর্চ। বললেন, 'চলো, একটু হেঁটে আসি।' পথে বাঁ-দিকে একটা বাড়ি দেখিয়ে বললেন, এটা বিনয় ভবন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'এই রাস্তা কোথায় গেছে?' উনি বললেন 'সুরুল-শ্রীনিকেতন।'

এবার ফেরা। অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। মধ্যে মধ্যে টর্চ জ্বালছিলেন পথের উপর। সেদিন অনেক কথা বলেছিলেন গান্ধীজি সম্পর্কে। মধ্যে একবার জীবনানন্দ সম্বন্ধে বললেন, 'আমাদের শুদ্ধতম কবি।'

তিন-চার দিন পরে কলকাতায় প্রেমেন্দ্র মিত্রের বাড়িতে। ১৯৫২ তে আইএ পাশ করে আমি স্কটিশে ভর্তি হই। তখন বন্ধুত্ব হয় দীপক মজুমদারের সঙ্গে। আমরা দুজনে সহপাঠী। দীপকের সূত্রে বিদ্যাসাগর কলেজের সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে। স্কটিশের সহপাঠী দীপক থাকত শ্যামবাজারে মহারানি হেমন্তকুমারী স্ট্রিটে। আমি থাকতাম হরি ঘোষ স্ট্রিটে 'দি রেসিডেন্স' মেস-এ। মেস-এর বোর্ডাররাই বলত 'হরি ঘোষের গোয়াল'।

একদিন স্কটিশ চার্চ ছুটির পরে কলেজ থেকে বেরিয়েছি। অমনি মুষলধারে বর্ষা। ছুটে ঢুকে পড়লাম পাশের বসন্ত কেবিন-এ। একটু পরে ভিজতে ভিজতে এল দীপক। আমাকে দেখে, আমাকে বগলদাবা করে রাস্তায় নেমে গান ধরল, 'এসো নীপবনে করো স্নান নব ধারাজলে' গান থামিয়ে বলল, 'নবধারাজলে স্নান করতে হলে শান্তিনিকেতনে যেতে হবে।' আমি গ্রে স্ট্রিটের মোড়ে এসে গেছি— চলে এলাম 'দি রেসিডেন্স'-এ। বৃষ্টিও ধরে গেল।

পরদিন সকালে 'দি রেসিডেন্স'-এ দীপক এসে হাজির। বলল, 'চলে নীপবনে সখীদের সঙ্গে নবধারাজলে স্নান করতে।' দুজনে শিয়ালদহ স্টেশনে এসে নামলাম বোলপুর স্টেশনে। অমনই বৃষ্টি। দীপক বলল, 'চলো হাঁটি।' ভিজতে ভিজতে দীপক চলে গেল মামা শান্তিদেব ঘোষের বাড়ি, আমি এলাম অন্নদাশঙ্করের বাড়ি। অন্নদাশঙ্করের স্ত্রী লীলা মাসি প্রথমে এক পশলা বকুনি। তারপর বড়ো মেয়েকে বললেন দাদার পাজামা পাঞ্জাবি দিয়ে বাথরুমে আমাকে ঢুকিয়ে দিতে।

পরদিন বৃষ্টিধরা সকালে বারান্দাতে চা খেতে খেতে মেসোমশায় বললেন, 'তোমার হোস্টেলের সমস্যা মিটেছে?' মেটেনি শুনে বললেন, 'তাহলে এখানে চলে এস। শিক্ষাভবনের হস্টেলে অনেক জায়গা। তা ছাড়া ওপেন শেলফ লাইব্রেরি। দেশ-বিদেশের স্কলাররা সারাক্ষণ আসছেন-যাচ্ছেন, তাঁদের কোম্পানি পাবে।' বড়ো মেয়ে জয়াকে বললেন, 'নিশিকান্তদার কাছে নিয়ে যাও।' আমাকে বললেন, 'এই চিঠিটা নিশিকান্ত সেনকে দিয়ো।' নিশিকান্ত সেন চিঠিটা পড়ে বললেন, 'ঠিক আছে, আজই ভর্তি হয়ে যাও।' আমি বললাম, 'কিছু তো নিয়ে আসিনি, কোনও টাকাপয়সাও আনিনি।' উনি মেসোমশায়ের চিঠি কপাল পর্যন্ত তুলে বললেন, 'এটা তো এনেছ।' আমি তবু বললাম, কলকাতায় গিয়ে মাকে চিঠি দিই, মা টিএমও করে টাকা পাঠাবেন, নিয়ে এসে শিক্ষাভবনে ভর্তি হয়ে যাব।'

নিশিকান্তদা বললেন, 'শোনো, তোমার বয়স অল্প, তাই জানো না, টাকা আসা-যাওয়ার পথে অনেক বিঘ্ন থাকে। তুমি মাকে শিক্ষাভবনের ঠিকানা দিয়ে অর্ডিনারি মানি অর্ডারে টাকা পাঠাতে লেখো। আর আমার এই চিঠিটা শিক্ষাভবনের অফিসে গিয়ে ভুজঙ্গদাকে দাও।' ভুজঙ্গদাকে নিশিকান্তদার চিঠি দিতে ভুজঙ্গদা চিঠিটা পড়ে হেসে বললেন, 'তোমাকে আজই শিক্ষাভবনে ভর্তি করে আজই হস্টেলে জায়গা দিতে লিখেছেন। কিন্তু তুমি টাকা দেবে দু-মাসের মধ্যে। কিন্তু তার মধ্যে পুজোর ছুটি হয়ে যাবে, তাহলে তিন মাসের মধ্যে টাকা দিলেই হবে।' জিজ্ঞেস করলাম, কত টাকা? ভুজঙ্গদা হিসেব করে টাকার অঙ্কটা বললেন। কলকাতায় এসে সব জানিয়ে মাকে চিঠি দিলাম। তারপর ট্রাঙ্ক বিছানা নিয়ে ফিরে এলাম শান্তিনিকেতনে।

শান্তিনিকেতনের অনেক অবিস্মরণীয় স্মৃতি। প্রথম স্মরণীয় স্মৃতি ৭ই পৌষ, সমাবর্তন ও জওহরলাল নেহরুর নাগরদোলা চড়া, নাগরদোলা থেকে তিনি নামলে তাঁর সঙ্গে হাত মেলানো, আমার হাতে শীতের সন্ধ্যাতে তাঁর উষ্ণ হাতের চাপ ও সামান্য ঝাঁকুনি।

দ্বিতীয় স্মৃতি দোলের সময় সাহিত্যমেলা। এটা ছিল অন্নদাশঙ্করের হৃদয়জাত ঘটনা। এক বছর আগে ঘটেছে একুশে ফেব্রুয়ারি। ঘটনাস্থল পূর্ব-পাকিস্তানের ঢাকা শহর। আজ অবশ্য এই ঘটনার ইতিহাস সবার জানা। এর থেকেই বাংলাদেশের জন্ম, পরে বাংলাদেশের প্রস্তাবে একুশে ফেব্রুয়ারি হল আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। কিন্তু ঢাকার বাইরে, একুশে ফেব্রুয়ারি প্রথম উদ্‌যাপিত হয় শান্তিনিকেতনে অন্নদাশঙ্করের পরিকল্পনায়। আমি প্রথম থেকেই সাহিত্যমেলার সঙ্গে যুক্ত ছিলাম।

একদিন জানুয়ারি মাসে অন্নদাশঙ্কর বললেন, 'এই বুধবারে বাড়িতে একটা সভা ডেকেছি— হীরেনদা, ক্ষিতীশদা, অশোকদা, আরো কেউ কেউ আসতে পারেন। তুমিও এসো। মাসিমাকে অতিথিদের আপ্যায়নে সাহায্য করবে।'

কিন্তু সাহিত্যমেলার শুরুটা মসৃণ ছিল না। উপাচার্য রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রথম আপত্তি ছিল— যারা তার জমিদারি কেড়ে নিয়েছে তারা আসবে শান্তিনিকেতনে, এটা প্রথমে মানতে পারেননি' কিন্তু একদিন পরেই তিনি মত বদলালেন। ক্ষিতীশদা (রায়) বললেন, 'বাবু চেঞ্জেস হিস মাইন্ড'।

রথীদা রাজি হলেন। পূর্ব-পাকিস্তানের বহু কবি সাহিত্যিককে আমন্ত্রণ পত্র পাঠানো হল। তখনকার কালে ভারত-পাকিস্তানে চিঠিপত্র যাতায়াত সহজ স্বচ্ছন্দ ছিল। অনন্ত চোদ্দো-পনেরো জনকে চিঠি পাঠানো হয়। আশঙ্কা ছিল পাকিস্তানের করাচি সরকার একসঙ্গে এত জনকে আসতে দেবে কি না। শেষপর্যন্ত এলেন পাঁচ জন। তিন জন প্রবীণ প্রাবন্ধিক, দুজন নবীন কবি। কবি দুজন হলেন শামসুর রহমান ও কায়সুল হক। অনেকদিন পর্যন্ত তাঁদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব ছিল। ক্রমে ভারত-পাকিস্তান

সম্পর্ক খারাপ হলে দু-দেশের মধ্যে অনেক রকম বাধানিষেধের পাঁচিল ওঠে, পাসপোর্ট-ভিসা কড়াকড়ি হয়।

অন্নদাশঙ্কর বার বার সাহিত্য থেকে চলে এসেছেন সমকালের নানা প্রসঙ্গে। কবিতা থেকে এসেছেন ছড়াতে, ছড়াতেও অসংখ্য বার স্বকালের সংকটে। অবশ্য কবিতা কখনোই স্বকালকে বর্জন করে না, আত্মস্থ করে নিজের সময়কে। জীবনানন্দ শুদ্ধ কবি হলেও উচ্চারণ করেছেন 'অদ্ভুত আঁধার' সম্বন্ধে।

রবীন্দ্রনাথের 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কিংবা 'মানসী' কাব্যগ্রন্থে স্বকালের প্রভাব বা প্রতিবিম্ব দেখা যায় না, অনেক বাঁকা চোখে হয়তো দেখা যেতে পারে, যা হবে খুবই কষ্টকল্পিত। 'সোনার তরী' 'চিত্রা'-র বেলাতেও একই কথা। কিন্তু পত্নী মৃণালিনী দেবীর মৃত্যুর পরে তাঁর কাব্যধারায় একটা পরিবর্তন দেখা যায়। সময়ের ছায়া পড়তে থাকে। 'বলাকা' থেকে একটু একটু করে শুরু। ক্রমশ স্পষ্ট হতে থাকে। 'পরিশেষে' ১৯৩৭-৩৮ নাগাদ একেবারে 'প্রশ্ন' ভগবানকে। 'জন্মদিন' ১৯৩৮ সালে লেখা। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সূচনাতে। তার পরিষ্কার ছাপ আছে কবিতাটিতে।

অন্নদাশঙ্কর লেখেন 'তেলের শিশি ভাঙলো বলে খুকুর পরে রাগ করো?' সেটা লেখেন ১৯৪৭ সালে দেশভাগের উপরে। এরপর থেকে অন্নদাশঙ্কর কোমর বেঁধে লেখেন বহু ছড়া— প্রায় সমস্ত ছড়াই সাময়িক প্রসঙ্গে।

জীবনানন্দ ও সত্যজিৎ

সুরজিৎ দাশগুপ্ত

অনেকদিন আগের কথা। ১৯৫০ সালের জুন মাসে দার্জিলিঙে ধসের সময় যখন আটকে পড়ি তখন বাজারের কাছে বাংলা বইয়ের দোকান থেকে 'আঠারো বসন্ত' নামে একটি বই কিনি। তাতে একটি কবিতা ছিল 'বনলতা সেন'। কবির নাম জীবনানন্দ দাশ। তার আগে জীবনানন্দ দাশের নাম শুনিনি, কবিতাও পড়িনি। স্কুলবেলা থেকেই প্রেমেন্দ্র মিত্র-র আমি ভক্ত ও তাঁর স্নেহে সিক্ত। তাঁকে চিঠি লিখি। তিনি জবাবে লিখলেন, 'জীবনানন্দ একেবারে অন্য ধরনের কবি।' সেবারেই পুজোর ছুটিতে দাদা কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজের লাইব্রেরি থেকে নিয়ে এলেন 'আধুনিক বাংলা কবিতা', প্রকাশক কবিতা ভবন। তাতে ছিল জীবনানন্দের চারটি কবিতা, প্রেমেন্দ্র মিত্রেরও চারটি কবিতা।

১৯৫১-র মে মাসে আমার এক কলেজ-বন্ধু ও আমি গরমের ছুটিতে যাই শান্তিনিকেতনে। বিকেলবেলা যাই অন্নদাশঙ্কর রায়ের খোঁজে। তিনি টেনিস খেলতে যাচ্ছিলেন উত্তরায়ণ-এ। আমরা জলপাইগুড়ি থেকে এসেছি শুনে ঘরে ঢুকে গেলেন। কিছুক্ষণ পরে বেরিয়ে এলেন। ট্রাউজার্স ও হাফশার্ট-এর বদলে ধুতি ও পাঞ্জাবি, হাতে র‍্যাকেটের বদলে টর্চ। আমাদের নিয়ে বেড়াতে চললেন শ্রীনিকেতনের পথে। পায়চারির সঙ্গে আলাপচারিতা। কথায় কথায় এল বাংলা কবিতার প্রসঙ্গ। জীবনানন্দ দাশের কথায় বললেন, 'আমাদের শুদ্ধতম কবি।'

শান্তিনিকেতন থেকে কলকাতায়। উঠলাম প্রেমেন্দ্র মিত্রের বাড়িতে। তাঁড় বড়ো ছেলে মৃন্ময়-এর ঘরে আমাদের আশ্রয়লাভ। প্রেমেন্দ্রর বন্ধু ধীরাজ ভট্টাচার্য জীবনানন্দর বাসার হদিশ বুঝিয়ে দিলেন। গেলাম জীবনানন্দর বাসাতে ১৮৩ ল্যান্সডাউন রোড। দরজা খুললেন জীবনানন্দই। খুললেন কিন্তু খুললেন-না, মানে একটুখানি বা আধখোলা খুললেন। জলপাইগুড়ি থেকে এসেছি শুনে ভয়ে ভয়ে আমাকে ভেতরে নিয়ে ঘরে বসালেন। বসলাম একটা বেতের মোড়াতে। উনি বসলেন টুলে। আলাপের বেশিটাই নীরবতা আর মাঝে মাঝে কথা। এভাবেই জীবনানন্দর সঙ্গে পরিচয়, ক্রমে ক্রমে পরিচয় গভীর হয়, যথেষ্ট অন্তরঙ্গতা হয়। তিনি ব্রাহ্ম, আমিও ব্রাহ্ম। কিন্তু তিনি পরে একদিন বলেছিলেন, 'ব্রাহ্ম হতে গেলে ব্রহ্মে বিশ্বাস করতে হয়।' আমি জিজ্ঞেস করি, 'আপনি ব্রহ্মে বিশ্বাস

করেন না?' তিনি ছোট্ট উত্তর দিলেন, 'মানবে বিশ্বাস করি। আমি মানববাদী।' এই কথাবার্তা হয় ১৯৫৪ সালে। আমি তখন বিশ্বভারতী থেকে স্নাতক হয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.এ. পড়ছি আর আছি এক ব্রাহ্ম পরিবারে— প্রণব দাস ও বিজুদির বাসাতে, সেটা গোলপার্কের কাছে সাউথ সিটি কলেজের উলটো দিকে। প্রণবদা-ই বলেছিলেন, 'জীবনানন্দ ব্রাহ্ম হয়ে কীভাবে অমন সব কবিতা লেখেন?' তার কথা শুনেই আমি প্রণবদার প্রশ্নটার প্রতিধ্বনি তুলেছিলাম জীবনানন্দের কাছে।

এখানে বলে রাখি প্রেমেন্দ্র মিত্রকে প্রেমেনদা বলতাম, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ও সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়কে স্যার বলতাম, অন্নদাশঙ্কর রায়কে মেসোমশায় বলতাম, সত্যজিৎ রায়কে মানিকদা বলতাম।

মানিকদা এক আশ্চর্য মানুষ— রবীন্দ্রনাথের পরে এক আশ্চর্য প্রতিভা, বহুমুখী প্রতিভা। সংগীতজ্ঞ, গল্পকার ও সাহিত্যিক, অঙ্কনশিল্পী, চলচ্চিত্রকার। রবীন্দ্রনাথের মতো তিনিও ব্রাহ্ম। এলোমেলোভাবে কথাগুলো বেরিয়ে আসছে লেখাতে। জীবনানন্দ প্রধানত কবি, উপন্যাসও লিখেছেন, কিন্তু জীবদ্দশাতে প্রকাশ করেননি। মৃত্যুর পরে তাঁর ভাই অশোকানন্দ দাশ সেগুলি প্রকাশ করেন। তাঁকে সাহায্য করেন ভূমেন্দ্র গুহ। কবিতা, উপন্যাস ও কয়েকটি প্রবন্ধ জীবনানন্দর সাহিত্যিক পরিচয়। তাঁকে বহুমুখী প্রতিভা বলা যায় না।

যাহোক, এবার জীবনানন্দ ও সত্যজিৎ প্রসঙ্গে আসি। আমি তখন জলপাইগুড়ি থেকে 'জলার্ক' পত্রিকার সম্পাদনা করছি। এই 'জলার্কে' জীবনানন্দের মোট চারটে কবিতা বেরিয়েছিল। শঙ্খ ঘোষেরও দুটি, শামসুর রাহমানের একটি কবিতা বেরিয়েছিল। জীবনানন্দের প্রথম যে-কবিতাটি বেরোয় সেটি হল 'শিরীষের ডালপালা'। এই কবিতাটি বুদ্ধদেব বসুর 'কবিতা'-তে প্রথমে বেরোয়। তাতে একটি ছাপার ভুল ছিল। সেই একই কবিতার শুদ্ধপাঠ বেরোয় 'জলার্ক'-তে। 'কবিতা'-তে যেখানে 'ভ্রূণ' শব্দটি ছিল 'জলার্ক'-তে সেখানে 'ঘ্রাণ' শব্দটি ছাপা হয়। দুর্ভাগ্যবশত 'বনলতা সেন' কাব্যগ্রন্থটির যখন বর্ধিত আকারে সিগনেট প্রেস থেকে বেরোয় এবং পরে ভারবি থেকে 'কাব্যসমগ্র' বেরোয়— সিগনেট ও ভারবি-র দুটি গ্রন্থেই ওই ভুলটি ছিল, কেউ জীবনানন্দের নিজের সংশোধন মান্য করেনি, বোধহয় আজও ভুলটি আছে। ভুলটি হল 'ভ্রূণ', হবে 'ঘ্রাণ'।

এবার সিগনেট প্রেস থেকে প্রকাশিত 'বনলতা সেন'-এর প্রচ্ছদ প্রসঙ্গে আসি। প্রচ্ছদটি করেছিলেন সত্যজিৎ রায়। এই প্রচ্ছদটি জীবনানন্দের একেবারেই পছন্দ হয়নি। আমাকে লিখেছিলেন 'এমন খারাপ প্রচ্ছদ সিগনেট প্রেস করবে ভাবিনি।' (উদ্ধৃতিটি যথার্থ হল কি না বলতে পারি না। আমাকে লেখা চিঠিটি সংকলিত হয়েছে শ্রীপ্রভাত দাসের 'প্রশ্নালাপ' গ্রন্থে। গ্রন্থটির প্রকাশক এবং মুশায়েরা।)

জীবনানন্দের চিঠিটি পাওয়ার পরে যখন কলকাতায় গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করি তখন তাঁকে বলি, 'জলার্ক'-র শুদ্ধপাঠ এখানে গ্রাহ্য হয়নি। তিনি বলেন, "তোমরা তো বুদ্ধদেবের কবিতা" নও, তোমরা শুদ্ধপাঠ ছাপলেও তা কলকাতার নজরে পড়ে না। জলার্ক জলেই ডুবে থাকে।'

তারপরে তুলি 'বনলতা সেন'-প্রচ্ছদ প্রসঙ্গ। তিনি তখন বললেন, 'দিলীপ গুপ্ত এসে বললেন আমার একটি কবিতার বই ছাপতে চান। তারপর দিলীপ গুপ্তের থেকে নরেশ গুহ এসে বললেন, কবিতা ভবন থেকে প্রকাশিত 'বনলতা সেন' চটি বইটার একটা বর্ধিত সংস্করণ বের করতে চান, মলাট করবেন সত্যজিৎ রায়। তিনিও আপনার মতোই ব্রাহ্ম। আমি রাজি হয়ে গেলাম। বড়ো 'বনলতা সেন'-এর সব কাজই নরেশবাবু করেছেন। এক হিসেবে নরেশ গুহ-ই সম্পাদনা করেন। তিনিই দিলীপ গুপ্ত আর সত্যজিৎ রায় আর আমার মধ্যে সব কাজের কাজি। বই বের হল। সত্যজিৎ মলাট করলেন। আমার মোটেই পছন্দ হয়নি। এ কি 'বনলতা সেন? যেন এক রাক্ষসী।'

আমি বললাম, 'উনি বোধহয় "শ্রাবস্তীর কারুকার্য" ইমেজটাকেই রূপ দিয়েছেন।'

তিনি বললেন, 'আর "বিদিশার নিশা"' দেখতে পেলেন না? এই প্রসঙ্গ শেষ করার আগে বলি জীবনানন্দের পরবর্তী কাব্যগ্রন্থ 'সাতটি তারার তিমির'-এর প্রচ্ছদ করেন সত্যজিৎ রায়। খুবই ব্যঞ্জনাময় প্রচ্ছদ। যোগাযোগ করেছিলেন আতাউর রহমান। তার পরেও জীবনানন্দর আরও বইয়ের প্রচ্ছদ করেন সত্যজিৎ। অধিকাংশই জীবনানন্দর মৃত্যুর পরে। তবে আমি জানি না সত্যজিতের প্রচ্ছদ করা বইগুলি এখনও আদি আকারে, আদি রূপে পাওয়া যায় কিনা জানি না। হয়তো 'পত্রালাপ'-এর সম্পাদক প্রভাত দাস বলতে পারবেন। আর একজন পারবেন দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়।

সুরজিৎ দাশগুপ্ত রচিত প্রবন্ধ দুটি যথাক্রমে *আরেক রকম* সপ্তম বর্ষ চতুর্থ এবং দ্বাদশ সংখ্যা থেকে পুনর্মুদ্রিত হল।

LIFE BEGINS AT 60!

JAGRITI DHAM

KOLKATA'S MOST COMPREHENSIVE HOME FOR SENIOR LIVING

SAFETY · ACTIVITY · COMMUNITY · SPIRITUALITY

Yoga & meditation

Wellness spa

Indoor games

Privilege access to IBIZA Club

24 x 7 Medical care

Mandir

ROOMS

- Furnished and fully-serviced AC rooms
- TV, balcony, attached toilet and pantry
- Housekeeping and maintenance on call
- Wi-fi, Intercom

SENIOR-FRIENDLY ARCHITECTURE

- Wheel chair and walker-enabled spaces and ramps
- Spacious lifts to accommodate stretchers
- Specially designed bathrooms with wheel chair-accessible showers

SECURITY

- 24 hours manned gate with intercom
- Electronic surveillance, CCTV
- Power back-up

HEALTHCARE

- 24 x 7 ambulance, attendant, emergency healthcare
- Visiting doctors, specialists-on-call
- Emergency button in every room and frequently occupied areas
- Tie-ups with the city's best nursing homes and hospitals

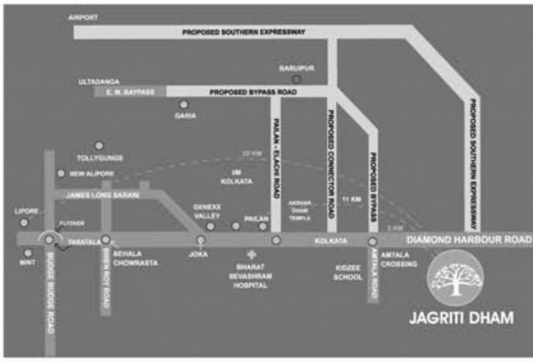

- Inside Merlin Greens complex
- Adjacent to Ibiza on Diamond Harbour Road
- Near Bharat Sevasram Hospital and Swaminarayan Dham Temple
- 5 kms from Nature Cure and Yoga Research Institute

+91 88 200 22022 | Merlin Greens, IBIZA Club, Diamond Harbour Road, Pin 743 503
contact@jagritidham.com | www.jagritidham.com

Issue date 1 January 2020. Registered No. KOL RMS/455/2019-2021
Registered with the RNI NO. WBBEN/2013/49896.
Vol. 8, Issue 1 Arek Rakam

ISO 9001:2008

NIGHTINGALE HOSPITAL

11, Shakespeare Sarani, Kolkata - 700 071
Phone : 2282-7465 / 7462 / 7969 - 72
Doctors Booking (10.00 a.m. to 6.00 p.m.)
98743 26662 / 98743 76667
Fax : 00-91-33-2282-6454
E-mail : feedback@nightingalehospital.com
Website : www.nightingalehospital.com

Published by Trishitananda Roy on behalf of Samaj Charcha Trust from 3rd Floor, 39A/1A, Bosepukur Road, Kolkata–700 042 and printed by him at S. P. Communications Pvt. Ltd., 31B Raja Dinendra Street, Kolkata–700 009.